প্রথম সংস্করণ ঃ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৬৭

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী (কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট) কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকালীপদ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান মজুমদার

বন্ধুবরেষু

লেখকের বক্তব্য

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন এবং কর্মশক্তি যেমন বিপুল, তেমনি বহুব্যাপ্ত। একখানা সামান্য নাটকের মাধ্যমে তার পরিচয় দিতে যাওয়া যে কতখানি দুরূহ ব্যাপার, কাজে হাত দিয়েই আমি তা মর্মে-মর্মে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু নতুন ভারতবর্ষের যিনি অগ্রদূত, তাঁকে সাধ্যমতো স্মরণ করাতেও অনেকখানি লাভ আছে। সে লাভের সুযোগটুকু আমি হারাতে চাইনি—গোড়াতে এই আমার কৈফিয়ৎ। এই নাটক কতখানি অভিনয়যোগ্য তা জানিনা, কারণ, নাট্যকার আমি নই; কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যুগস্রষ্টা মানুষটিকে কিছু পরিমাণেও যদি ফোটাতে পেরে থাকি, তবেই আমি সার্থক হয়েছি।

রামমোহনের জীবন-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। সে তর্কের ক্ষেত্র ঐতিহাসিকের—আমার নয়। আমি সকলের কাজ থেকেই অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি এবং মোটামুটি একটা মধ্যপন্থা আশ্রয় করে এই নাটকের কাঠামো গড়ে তুলেছি। রামমোহন সম্বন্ধে যে-সমস্ত উপকরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলির ওপর নির্ভর করে এবং ঐতিহাসিক সততাকে যথাসাধ্য রক্ষা করেই অগ্রসর হতে চেয়েছি। স্বাধীনতা নিয়েছি নামমাত্র এবং যেটুকুও নিয়েছি তা কল্পনাশ্রিত নয়—সম্ভাব্যতার (probabilityর) ওপরেই নির্ভরশীল। কর্মী ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামমোহনের জীবন এত বিচিত্র ঘটনার দ্বন্দ্বে আলোড়িত যে সেগুলিকে উপযুক্তভাবে সাজাতে পারলেই তারা নাটকীয় হয়ে ওঠে। অপরিসীম প্রলোভন-সত্ত্বেও এমন বহু জিনিসকে আমি ব্যবহার করতে পারিনি—যেগুলি অবলম্বন করে আরো অন্তত তিনখানা নতুন নাটক রচনা করা চলে।

নাটক ইতিহাস নয়—সেই কারণে রামমোহনের অপরা জীবিত

স্ত্রী'কে এই নাটকে স্থান দিইনি। তাঁর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উমা দেবীই ছিলেন তাঁর সত্যিকারের সহধর্মিণী, তাঁর নেপথ্য অনুপ্রেরণা। তাঁর পিতৃদেব রায়রায়ান রামকান্ত এবং অগ্রজ জগমোহন সম্বন্ধেও এই-ই আমার বক্তব্য। আশা করি, এ অপরাধ মার্জনীয়।

রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সূচনাতেই আমি নাটকের যবনিকা টেনেছি। তারপরে আর অগ্রসর হওয়া নাট্যকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু এই পরবর্তী অধ্যায়ও রামমোহনের কীর্তি এবং গৌরবে সমুজ্জ্বল। ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে দিল্লীর বাদ্‌শাহ দ্বিতীয় আকবরের দৌত্য এবং 'রাজা' উপাধি নিয়ে যেদিন অ্যাল্‌বিয়ন জাহাজে তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে দিনটি ভোলবার নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে যত বাধাই সৃষ্টি হোকনা কেন, ইংল্যাণ্ড সেদিন পরম সমাদরেই তাঁকে গ্রহণ করেছিল। তাঁর রচনা, তাঁর কর্মশক্তি এবং তাঁর মনীষার সংবাদ ইতোমধ্যেই ইয়োরোপকে আলোড়িত করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো প্রাচ্যবাসীকে পাশ্চাত্যের অন্তর কখনো এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেনি।

যে কোম্পানি দেশে তাঁর বাদশাহের দৌত্য স্বীকার করতে চায়নি, ইংল্যাণ্ডে সেই উদ্ধত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও তাঁর কাছে নত হল। দূতের সম্মান দিয়ে ভোজ-সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করল তারা। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক পণ্ডিত উইলিয়াম রস্‌কো, লেখক জন ফস্টর, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম প্রভৃতি তাঁকে সম্মান জানালেন। স্বাধীনতার তীর্থ La France-এও তিনি পেলেন বরণমাল্য।

সংগ্রামী রামমোহন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। পার্লিমেণ্টের লর্ডসভায় রক্ষণশীল দলের ভারত-সংক্রান্ত বিরোধিতা রোধ করবার তিনি আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন। কর্ম এবং শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের আসন তুলে ধরেছেন ইয়োরোপের চোখের সামনে।

কিন্তু সে বিদেশেও তাঁর দেশ তাঁকে বঞ্চনা করল। দেশ থেকে প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ-সাহায্য তিনি পেলেন না—দিল্লীর বাদশা পাঠালেন না তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। জীবনের শেষ দিনগুলিতে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে লড়াই করতে করতে—বাড়িওলার তাগিদের অসহ্য অপমানে জর্জরিত হয়ে ১৮৩৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ব্রিস্টলের স্টেপলটন গ্রোভে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

মহামানবমাত্রেই দেশের কাছ থেকে এমনি প্রতিদান চিরকাল পেয়ে আসছেন। রামমোহনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিক্ষায়, সমাজ-সেবায় এবং অর্থনৈতিক ও বিচার-বিভাগীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রামমোহনের যে অপরিসীম দান, তা বিস্তৃত আলোচনার বস্তু। নাটকে তার সামান্যমাত্র আভাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়—সে চেষ্টাও আমি করিনি। শুধু এইটুকুই স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন শুধু আধুনিক বাংলাদেশেই নয়—আধুনিক ভারতবর্ষেরও স্রষ্টা। মিস্ কোলেট্ রামমোহনের জীবনী রচনা করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, "Rammohun stands forth as the tribune and prophet of new India." এই উক্তির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র আতিশয্য নেই, এই বিরাট পুরুষের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করলেই সে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে একজন ইংরেজ সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন, শুধু সেইটির পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট :

"The character of a nation is always in a great degree depended upon the character of individuals. The names of such men as Shakespeare and Milton and Bacon and Newton, give a more distinct idea of England's mental greatness than could be produced by an elaborated essay on the subject and specimens of human nature when the

character of English intellect is the subject of discussion. The single name of Rammohun Roy is cherished by the more enlightened of his countrymen with gratitude and veneration, because they feel how much they owe him. When foreigners speak with insulting contempt—as they often do—of the native intellect—the name Rammohun Roy is appealed to as an answer." (Bengal Herald, 17th. January, 1841—J. K. Majumder-এর Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India"র উদ্ধৃত ।)

এই নাটক রচনায় যাঁরা নানাভাবে উপদেশ দিয়ে এবং সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আমাকে তিনি ব্যবহার করতে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশগুলিও আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্তী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং খ্যাতনামা অভিনেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্য রায়ের কাছেও নানাভাবে আমি ঋণী।

প্রথম অঙ্ক

—এক—

[রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি। এই বাড়ির একটি প্রশস্ত ঘর। আনুমানিক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘরটি সেকালের রেওয়াজ মতো সাজানো। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যাবে, গৃহস্বামী অর্থভাগ্যে ভাগ্যবান। মুসলমানী কেতার সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি রুচিও নজরে পড়বে।

প্রৌঢ় রামকান্ত রায় সৌখিন কাজ করা বড়ো একখানা খাটে একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়া টানছেন। তাঁর কপালে চন্দনের তিলক, ফতুয়ার ওপর দিয়ে গলার তুলসী মালাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ পুরুষ।

একটা অপ্রিয় অনিশ্চিত আশঙ্কায় রামকান্তের ললাট কুঞ্চিত। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্বস্তিভরে তিনি গড়গড়ায় নল নামিয়ে রাখলেন। খাট থেকে নেমে এলেন, ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর হাতে কড়োজ্ঞালি। মালা জপ করতে চেষ্টা করছেন, তবু পেরে উঠছেন না। খুব অস্থির।

রামকান্তের স্ত্রী তারিণী দেবী প্রবেশ করলেন। মধ্যবয়স্কা, রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও তার আর একটি বিশেষত্ব প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যাবে। তাঁর চোখে মুখে একটা গর্বিত ব্যক্তিত্বের ছবি—দৃঢ় সংকল্পের আভাস]

তারিণী॥ কী ভাবছ? (রামকান্ত ফিরে দাঁড়ালেন)

রামকান্ত॥ ভাবছি? (মৃদু বিষণ্ণ হাসলেন) আকাশ-পাতাল! চারদিক থেকে বিপদের কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে ফুলু। (গম্ভীর হয়ে গেলেন) জমিদারীর অবস্থা তো জানো।

তারিণী॥ ভুরশুট পরগণার ইজারা?

রামকান্ত॥ সেও এক রকম করে চলে যেত—কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে বর্ধমান রাজসরকারকে নিয়ে। প্রায় আশী হাজার টাকা পাবে, রাজসরকার থেকে নালিশ হলে জেলে যাওয়া ছাড়া আর পথ দেখছি না ফুলু।

তারিণী ॥ এখনি ওসব কথা কেন ভাবছ? মহারাণী বিষ্ণুকুমারী তো তোমাকে খুব স্নেহ করেন।

রামকান্ত ॥ হাঁ—তা করেন। কিন্তু তিনি আর ক'দিন? তাঁর শরীরের যে অবস্থা তাতে কতদিন বাঁচবেন বলা শক্ত। তাঁর মৃত্যুর পরে কী হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাতে আমার ঘুম আসে না। জগৎটা যদি মানুষ হত, তা হলেও আমায় এত দুর্ভাবনা করতে হত না। বৈষয়িক বুদ্ধি একেবারে নেই। রামলোচনও নেহাৎ ছেলেমানুষ। ভরসা করবার মতো একজন কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

তারিণী ॥ কেন, মোহন? অমন বিদ্বান্ ছেলে—

রামকান্ত ॥ (থামিয়ে দিয়ে) বিদ্বান্—বুদ্ধিমান্! ওইখানেই আমার ভুল হয়েছে ফুলু, জীবনের সব চাইতে বড় ভুল! কী দরকার ছিল? জমিদারের ছেলে, বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেবার মতো বিদ্যাই ছিল যথেষ্ট তার পক্ষে। ছেলেকে পণ্ডিত করবার জন্যে পাঠালাম পাটনায়, আরবী-ফারসী শিখে ছেলে আমার "মৌলানা" হয়ে এল! তাতেও আমার শিক্ষা হল না, আমি তাকে সংস্কৃত পড়তে পাঠালাম কাশীতে। তার কী ফল হয়েছে তুমি নিজেও জানো। তারি ওপর তুমি আমায় নির্ভর করতে বলছ?

তারিণী ॥ এ তোমার মিথ্যে ভাবনা। ছেলের পণ্ডিত হওয়াটা এমন কি অপরাধ যার জন্যে তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারছ না?

রামকান্ত ॥ পণ্ডিত হওয়া অপরাধ নয় ফুলু। তোমার ছেলে ম্লেচ্ছ হতে চলেছে!

তারিণী ॥ ম্লেচ্ছ! এ তোমারও বাড়াবাড়ি। ষোলো বছরের ছেলে কী লিখেছিল না লিখেছিল—

রামকান্ত ॥ কী লিখেছিল! (উত্তেজিত) তুমি দেখোনি সে খাতা,

আমি দেখেছি। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা নিয়ে সে কী যুক্তিতর্ক আর কটু সমালোচনা! ভাবতে পারো ফুলু, রায় রায়ান কৃষ্ণচন্দ্রের বংশে এমন অনাচার! বিষ্ণুমন্ত্রে যাদের নিত্য উপাসনা, যাদের ওপর প্রভু রাজরাজেশ্বরের আশীর্বাদ—সেই বংশের ছেলে আজ বিগ্রহ পূজোর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়! কোরানের যুক্তি দিয়ে হিন্দুর দেবপূজোকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়!

তারিণী॥ সে অজ্ঞানের পাপকে তুমি তো ক্ষমা করোনি! সেদিন তাকে তো একরকম বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিলে।

রামকান্ত॥ হাঁ, দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শিক্ষা হবে। কিন্তু হয়নি। অতটুকু ছেলে দুর্গম হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে চলে গেল! সহায় নেই—সম্বল নেই—ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে কোন্ প্রান্ত থেকে কোথায় চলে গেল সে! দেখলাম, সত্যি সত্যিই রায়রায়ান বংশের ছেলে! যেমন শক্তি, তেমনি দুঃসাহস!

তারিণী॥ এ তো গৌরবের কথা!

রামকান্ত॥ গৌরব! না—না! ওই শক্তি—ওই সাহসই আমার ভয়! মনে হচ্ছে আমি ওকে রুখতে পারব না—একটা ঝড়ের হাওয়ার মতো সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি তারিণী—রায়রায়ান বংশের ওপর সর্বনাশ আসছে। আর তার জন্যে দায়ী কে জানো? দায়ী তোমার ছেলে রামমোহন।

তারিণী॥ এ তুমি কী বলছ?

রামকান্ত॥ ঠিক বলছি, ঠিক বলছি আমি। কেন এমন হল? পরম বৈষ্ণব এই পরিবার! আপদ-বিপদ-অমঙ্গল কতবার এসেছে, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ বিপদের মুখে হাল ধরে তুফান পার করে দিয়েছেন। আজ কেন চার দিক থেকে সব এমন করে ডুবতে চলেছে? তারিণী, আমি জানি, আমি জানি! বৈষ্ণবের ঘরে ম্লেচ্ছ জন্ম নিয়েছে,

ধর্মের ভিত নড়ে উঠেছে—রাজরাজেশ্বর মুখ ফিরিয়েছেন। (আরো উত্তেজিত) যাবে তারিণী, সব যাবে!

তারিণী ॥ কেনো এমন করছ তুমি? ক'দিনও হয়নি, ছেলে তিব্বত থেকে ফিরেছে। হয়তো মতি-গতি বদলে গেছে—

রামকান্ত ॥ বদলে গেছে? (তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন) কিন্তু আমাকে বলতে পারো, এই ক'দিনের মধ্যে একবারও সে মন্দিরে গেছে, একবারও প্রণাম করেছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে? মনকে মিথ্যে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই তারিণী! রায় বংশে মুষল জন্মেছে তোমার ছেলে—সর্বনাশ হয়ে যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে! (যাওয়ার উপক্রম করে ফিরে দাঁড়ালেন) তোমার বাবার অভিশাপ মনে আছে তারিণী? সেই অভিশাপ আজ ফলতে চলেছে!

(রামকান্ত উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।
তারিণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।)

তারিণী ॥ বাবার অভিশাপ! না!

(কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর ডাকলেন)

উমা—উমা—

(উমা দেবী প্রবেশ করলেন)

উমা ॥ ডাকছেন মা?

তারিণী ॥ মোহন কোথায় বউমা?

উমা ॥ পড়ছেন।

তারিণী ॥ পড়া—পড়া—দিনরাত পড়া! সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যেই ডুবে আছে! যাও, একবার আসতে বলো আমার কাছে। দরকারী কথা আছে। (উমা বেরিয়ে গেলেন) বাবার অভিশাপ! না—না, অসম্ভব! কখনো হতে পারে না!

[কুড়ি বছরের দীর্ঘকায় সুদর্শন রামমোহন প্রবেশ করলেন।]

রামমোহন ॥ ডাকছিলে মা ?

(তারিণী চোখ তুলে তাকালেন)

তারিণী ॥ এসো—বসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

(রামমোহন একটা নিচু আসন টেনে নিয়ে মার পায়ের কাছে বসলেন)

রামমোহন ॥ কী মা ?

তারিণী ॥ বর্ধমানের দেনার অবস্থা বোধ হয় সব শুনেছ ?

রামমোহন ॥ শুনেছি বইকি। কিন্তু কাজটা বাবা ভালো করেননি। সরকার থেকে অতগুলো টাকা বাজে খরচ না করলে আজ এমন অবস্থায় পড়তে হত না। পরের টাকা-পয়সার ব্যাপারে সতর্ক থাকাই ভালো।

তারিণী ॥ (ভ্রূকুঞ্চিত করলেন) তোমার বাবার কাজের সমালোচনা করে লাভ নেই মোহন! সে কথা থাক। কিন্তু তোমরা এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁকে কিছু সাহায্য তোমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত। তোমার দাদাকে তো জানোই—বিষয়বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। লোচনও ছেলেমানুষ। এ অবস্থায় তোমার দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি, বাবা!

রামমোহন ॥ বেশ তো। তোমরা যা করতে বলো, তাই করব।

তারিণী ॥ একবার মহলে যাও। দেখো, কিছু বাকী বকেয়া আদায়-পত্র করে কোনো রকমে তাল সামলানো যায় কিনা!

রামমোহন ॥ তাই হবে (উঠে পড়লেন, , তারিণী বাধা দিলেন)—

তারিণী ॥ একটু বোসো। (রামমোহন বসলেন, সামান্য দ্বিধা করে তারিণী বললেন) হয়তো জানো মোহন, তোমার সম্পর্কে তোমার বাবার একটা আশঙ্কা আছে।

রামমোহন ॥ জানি।

তারিণী ॥ সে আশঙ্কা নিশ্চয় মিথ্যে ?

রামমোহন ॥ না।

তারিণী ॥ (চমকে উঠলেন) না !

রামমোহন ॥ সত্য চিরদিনই সত্যই থাকে মা। সে বদলায় না।

(তারিণী খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন)

তারিণী ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও—চার বছর আগে যে বিশ্বাস নিয়ে তুমি ঘর ছেড়েছিলে, সে বিশ্বাস আজও তোমার অটুট ?

রামমোহন ॥ শুধু অটুট নয় মা। এই চার বছরে আমার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি আরো পাকা হয়েছে।

তারিণী ॥ (চকিত) মোহন !

রামমোহন ॥ (আত্মগত) দেখলাম ভারতবর্ষকে। যেখানে গেছি —দেখেছি একটি মাত্র চেহারা ! অজস্র জাত, অসংখ্য সম্প্রদায়। সবাই হিন্দু—অথচ কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কেউ শাক্ত, কেউ রামায়েৎ, কেউ লিঙ্গায়েৎ, কেউ দাদুপন্থী, কেউ কবীরপন্থী, কেউ বৈষ্ণব, কেউ গাণপৎ। বিচিত্র সব দেবতা, বিচিত্র তাদের কুসংস্কার !

তারিণী ॥ কুসংস্কার। মানুষের ধর্মকে তুমি কুসংস্কার বলো !

রামমোহন ॥ ধর্ম ! কাকে তুমি ধর্ম বলো মা ! তুমি যা মানো, অন্যে তা মানতে চায় না। অন্যের যা প্রথা, তোমার কাছে তা অবিশ্বাস্য ! সারা ভারতবর্ষে হিন্দু নামে একটা জাত আছে বটে। কিন্তু কে সেই হিন্দু—তার উত্তর কে দেবে !

তারিণী ॥ হুঁ !

রামমোহন ॥ সারা দেশ খুঁজে দেখলাম—হিন্দু কোথাও নেই। আছে কতগুলো দল আর কতগুলো দেবতা ! সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা নোয়াতে নোয়াতে জাতটার মেরুদণ্ড ধনুকের মতো

বাঁকা হয়ে গেছে। সত্য নেই—আছে শুধু সংস্কার! প্রতিবেশী মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু বিদ্বেষ আর ঘৃণার। মনে পড়ল: দেশ জুড়ে একদিন মহামিলনের বাণী শুনিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। দীপঙ্কর শীলভদ্রের পথ বেয়ে গেলাম বৌদ্ধের দেশ তিব্বতে। কৈলাসের পাহাড় আর আর মানস সরোবর ডিঙিয়ে সত্যকে জানতে গেলাম। কিন্তু সেখানেও দেখলাম এই বিকার! ধর্ম মিথ্যে হয়ে গেছে, যুক্তির মূল্য নেই! ভাবতে পারো মা, তারা একজন মানুষকে দালাই লামা সাজিয়ে তাকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা বলে কল্পনা করে নেয়?

তারিণী॥ তুমি বলতে চাও কী? (তার স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল)

রামমোহন॥ আমি বলতে চাই—একটি মাত্র পথে সব সমস্যার সমাধান আছে। হিন্দুর হোক—মুসলমানের হোক—ঈশ্বর একমাত্র; 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই এক অদ্বিতীয়ই সারা ভারতবর্ষকে একসঙ্গে মেলাতে পারে—হিন্দু মুসলমানের ভেদ ঘোচাতে পারে—দেশ জুড়ে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে পারে!

তারিণী॥ মোহন, চার বছর আগে মনে হয়েছিল, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সেদিনের কথাগুলো তাই উড়িয়েই দিয়েছিলাম! আজ দেখছি তোমার বাবাই ঠিক বুঝেছিলেন! রায়রায়ান বংশের ওপর সর্বনাশ ঘনিয়ে আনছ তুমি!

রামমোহন॥ সর্বনাশের কথা কেন উঠছে মা? আমি তো কোনো নতুন কথা বলছি না। এ যে আমাদের শাস্ত্রেরই বাণী—উপনিষদের কথা!

তারিণী॥ শাস্ত্র! কতখানি জানো তুমি শাস্ত্রের? আমি তোমায় বলছি মোহন, এখনো সময় আছে। এখনো ফিরে এসো। দেশাচার-লোকাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ো না! সে অপরাধের জন্য কেউ তোমায় ক্ষমা করবে না—হয়তো আমিও না।

রামমোহন ॥ তোমার ক্ষমা যদি না পাই মা, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমার আর নেই। কিন্তু সত্যিকারের যা ধর্ম, দেশাচার-লোকাচারের দাম কি তার চেয়েও বেশি ?

তারিণী ॥ (অধৈর্য) তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আবার বলছি, আগুন নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না! তার পরিণাম কারো পক্ষেই শুভ হবে না!

(রামকান্ত পুনঃ-প্রবেশ করলেন। রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন)

রামকান্ত ॥ ওঃ—তুমি! বোসো—বোসো!

(নিজে বসলেন, রামমোহন দাঁড়িয়ে রইলেন)

তারিণী ॥ শুনছ, মোহন মহলে যেতে চাইছে।

রামকান্ত ॥ বেশ, যাক। কিন্তু কোনো লাভ নেই তারিণী। আমি জানি—সব ডুববে। কিছুই থাকবে না—কিছুই না।

তারিণী ॥ তুমি কেন অমন করছ বলো দেখি ? কেন এমন ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছো ?

রামকান্ত ॥ হাল আমি ছাড়িনি—যিনি ছাড়বার তিনিই ছেড়েছেন! রাজরাজেশ্বর মুখ ফিরিয়েছেন। (হঠাৎ রামমোহনের দিকে তাকালেন) তুমি মানো সে কথা ?

রামমোহন ॥ না বাবা!

রামকান্ত ॥ মানো না! কেন মানো না ?

রামমোহন ॥ পাথরের বিগ্রহ এক জায়গায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে বাবা! সে তো কখনো মাথা ফেরাতে পারে না!

রামকান্ত ॥ (উত্তেজিত) শোনো তারিণী, শোনো। এর পরেও বলতে চাও অমঙ্গলের কিছু বাকি আছে ? এর পরেও কি রায় বংশের মাথার ওপরে বাজ পড়বে না ?

রামমোহন ॥ আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন বাবা!

রামকান্ত ॥ মিথ্যে! হিন্দু-ধর্মকে তুমি তুচ্ছ করবে, দেবতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে, তবু আমি উত্তেজিত হব না!

রামমোহন ॥ কিন্তু—

রামকান্ত ॥ আবার সেই কিন্তু! আমার সব কথায় 'কিন্তু' বলবার একটা বদ্-অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেছে তোমার! সব কিছুতেই তুমি প্রতিবাদ করতে চাও! কী ভেবেছে নিজেকে? দু-পাতা ফার্সী আর সংস্কৃত পড়ে সমস্ত শাস্ত্রকে এনে ফেলেছ তোমার মুঠোর মধ্যে?

রামমোহন ॥ না বাবা, এতবড় অন্যায় দাবী আমার নেই। শাস্ত্র মহাসাগর—সারা জীবন চেষ্টা করলেও তার পার পাওয়া যাবে না। তবু আপনি যদি আমার সামান্য শাস্ত্রজ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চান, সাধ্যমতো উত্তর দেব!

রামকান্ত ॥ কী! তুমি আমায় শাস্ত্র-বিচারে আহ্বান করছ! (চেঁচিয়ে উঠলেন) মূর্খ, নাস্তিক—তোমার মতো ছেলে থাকার চাইতে না থাকাই ছিল ভালো! (রাগে কাঁপতে লাগলেন)

তারিণী ॥ আঃ—কী হচ্ছে এ সব পাগলামি!

রামকান্ত ॥ ও আমার কেউ নয় ফুলু—কেউ নয়!

তারিণী ॥ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? সব কথা নিয়েই কি এত পাগলামি করতে হয়। বিস্তর বেলা হয়েছে, এখন চান করবে চলো।

রামকান্ত ॥ (তারিণীর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে) আমি ঠিক জানি, তারিণী। শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁর কথা কখনো মিথ্যে হবে না।

(রামকান্ত এবং তারিণী চলে গেলেন ;
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রামমোহন।)

—দুই—

[রায়রায়ান রামকান্ত রায়ের বাড়ি।

অন্তঃপুরের একটি ঘর—রামমোহনের শয়ন-কক্ষ। স্তূপাকার ফার্সী ও সংস্কৃত পুঁথি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে খাট এবং অন্যান্য গৃহসজ্জা।

রামমোহনের স্ত্রী উমা এবং জগমোহনের স্ত্রী অলকা দেবীর মধ্যে কথা চলছে। উমা ভয় পেয়েছেন, অলকা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছেন।]

অলকা ॥ তুই ওকে বুঝিয়ে বলতে পারিসনে উমা ?

উমা ॥ বাবা-মা যাকে বোঝাতে পারেন না দিদি, সে আমার কথা শুনবে কেন ? তুমি কি চেন না ওঁকে ?

অলকা ॥ তা আর চিনিনে ! এ ঘরে যখন পা দিয়েছিলাম, তখন তো ঠাকুরপো সাত বছরের। কিন্তু তখন থেকেই কী জেদ অতটুকু ছেলের। যা ধরত, তাই করে ছাড়ত। কিন্তু এখন বড় হয়েছে—বুদ্ধিশুদ্ধিও হয়েছে। এখনো কি অত পাগলামি করলে চলে ?

উমা ॥ কেলেঙ্কারীও তো নেহাৎ কম হল না দিদি ! রোজ রোজ এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। বাবার মুখের দিকে তাকানো যায় না, মাও যেন কেমন হয়ে উঠছেন দিনের পর দিন ! কিন্তু কোনো কথা উনি শুনবেন না। বলেন, সত্য বলে যা জেনেছি, মরে গেলেও তা ছাড়তে পারব না। বাবার জন্যেও না—মার জন্যেও না !

অলকা ॥ যা ধরবে তা চরম করে ছাড়বে—এই ওর স্বভাব। পাটনায় পড়তে যাবার আগে ঠাকুর-দেবতায় কী ভক্তিই ছিল ঠাকুরপোর ! একবার সকালে সংস্কৃত রামায়ণ নিয়ে বসল। পড়া শেষ না করে কিছুতেই সে উঠবে না ! সারা দিন বই নিয়ে না খেয়ে রইল—মারও খাওয়া হল না।

উমা ॥ এখনও তো বই নিয়ে বসলে আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

অলকা ॥ কিন্তু এত পড়ে পরে কী বুদ্ধি হল ? মনে আছে, বাড়িতে

সেবার কীর্তন হচ্ছে—মানভঞ্জন পালা! ও একেবারে কেঁদেই আকুল। কেষ্ট স্বয়ং নারায়ণ—তিনি কিনা শ্রীরাধার পা ধরবেন! কিছুতেই তা হতে দেবে না। শেষকালে ওকে আসর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দুপুর বেলা একা মন্দিরে বসে অঝোরে কাঁদত : ভগবান কি আমায় দেখা দেবেন না?

উমা॥ ওই ফার্সী পড়েই যে কাল হল দিদি!

অলকা॥ লেখাপড়া শিখলেই কি ছাই অমন হতে হবে? ফার্সী তো ঠাকুরও পড়েছেন, ওর দাদাও পড়েছে। তাই বলে এসব মুসলমানের মতো কথাবার্তা বলবে? নিশ্চয়ই মাথায় দোষ হয়েছে ওর।

উমা॥ (কাতর) কী যে করব দিদি—কিছুই বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে ওঁর জ্বালায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

অলকা॥ আমার মনে হচ্ছে এখন ঠাকুরপোর চিকিৎসা করা দরকার। ভালো কবিরাজী তেল হলে উপকার হবে। এ শুধু বাতিকের ব্যারাম—মধ্যমনারায়ণ তেল পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে সব!

(রামমোহন ঢুকলেন)

রামমোহন॥ কার জন্যে মধ্যমনারায়ণ তেল বৌঠান? তোমার?

(উমা লজ্জিতভাবে জিভ কাটলেন, ঘোমটা টেনে পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে)

অলকা॥ আমার জন্যে কেন হবে! পড়ে পড়ে যারা মাথা গরম করে, তাদেরই ওসব দরকার। সত্যি ঠাকুরপো, এত লেখাপড়া করে দিনকে দিন তুমি কী হয়ে উঠছ বলো তো?

রামমোহন॥ (হাসলেন) জানোয়ার। কী বলো? (বসলেন)

অলকা॥ ছিঃ ছিঃ! মুখে তোমার কিছুই কি আটকায় না? এত বিদ্বান হয়েই তুমি এমন অধঃপাতে গেছ!

রামমোহন॥ যা বলেছ। সংসারে মূর্খই সব চেয়ে নিরাপদ। সে যাক—এখন হুকুমটা কী বলো? কী করলে খুশি হও? ফরমাইয়ে।

অলকা ॥ আমাদের খুশি করার ভাবনটা এখন থাক। কিন্তু এতবড় পণ্ডিত হয়েও কি তুমি বোঝো না এমন করে বাবা-মার মনে দুঃখ দিতে নেই? তাঁরা যা পছন্দ করেন না, সে-সব কি তাঁদের মুখের ওপর না বললেই নয়?

রামমোহন ॥ মায়ের পরই তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি বৌঠান। আজ তুমিই আমার একটা কথার জবাব দাও। আমাকে তুমি কি মিথ্যাবাদী হতে বলো?

অলকা ॥ না-না, তা বলব কেন? কিন্তু—

রামমোহন ॥ এর মধ্যে তো কোথাও কিন্তু নেই। যা সত্য, তাকে প্রকাশ না করা নিজের বিবেকের কাছে মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়!

অলকা ॥ তাই বলে ওঁদের দুঃখ দিয়ে—

রামমোহন ॥ ওঁদের দুঃখের চাইতেও অনেক বড় দুঃখের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে যে সারা ভারতবর্ষের দুঃখ! শপথ নিয়েছি—এর প্রতিকার আমি করবই। একটি জাতি—একটি ধর্মের মধ্য দিয়েই সারা জাতটাকে আমি গড়ে তুলব! 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শুধু আমার ধর্ম নয়, সে আমার ভারতবর্ষ বৌঠান!

অলকা ॥ কিন্তু প্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ভালো ঠাকুরপো!

রামমোহন ॥ শাস্ত্র! ক'জন শাস্ত্র পড়েছে বৌঠান, ক'জন জেনেছে তার মর্ম? শাস্ত্রের নামে কতগুলো সংস্কার ভূতের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে। যে দিকে তাকাই একটা মানুষ তো কোথাও দেখতে পাই না! শক্তি নেই, বিচারবোধ নেই, সত্য-জিজ্ঞাসা নেই! শুধু একদল ভূতে-পাওয়া লোক বিকারের ঘোরে পথ হেঁটে চলেছে। শাস্ত্র—ধর্ম! একজন কুলীন তিনশো বিয়ে করবে, তার নাম ধর্ম! পাঁচ বছরের বিধবাকে পঁচানব্বুই বছরের স্বামীর চিতায়

পুড়িয়ে মারবে, তাকে বলবে ধর্ম ! দরিদ্রনারায়ণকে একমুঠো খেতে না দিয়ে পাথর আর পেতলের মূর্তির গায়ে হীরে-জহরৎ চাপিয়ে বলবে—ধর্ম ! (উত্তেজিত) না, বৌঠান, না !

অলকা ॥ ঠাকুরপো !

রামমোহন ॥ (উঠে দাঁড়ালেন) এ আমি কিছুতেই সইব না। ধর্মের উদ্দেশ্য জাতকে বাঁচিয়ে রাখা : কিন্তু সে ধর্ম যখন জাতির গলায় ফাঁসি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ফাঁস ছিঁড়ে ফেলাই চাই বৌঠান !

অলকা ॥ কিছুই বুঝছি না ! খালি মনে হচ্ছে, তুমি একদিন সর্বনাশ ঘটাবে ঠাকুরপো !

রামমোহন ॥ (হাসছেন) সর্বনাশ ? না, বৌঠান ! সত্য। তার সময় হয়ে গেছে—সে আসবেই। তাকে রোধ করা যাবে না ! আমি তোমায় বলছি—দিন বদলাবে ! ধর্মের নামে এই মূঢ়তার পালা চুকে যাবে। আর সে কাজের ভার নিয়ে আমাকেই হয়তো সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। (হাসলেন) সেই ভাবী যুদ্ধে যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকে কিছু রসদ চাই আপাতত। এখন সেরটাক চিঁড়ে আর গোটা কুড়িক কলা বের করো দেখি।

অলকা ॥ সেরটাক চিঁড়ে ! কুড়িটা কলা !

রামমোহন ॥ জেনেশুনেও কেন লজ্জা দাও ? জানোই তো ওর কমে আমার এই রাক্ষুসে পেটটার একটা কোনাও ভরতে চায় না ? যাও —যাও। তখন থেকে বকিয়ে বকিয়ে তোমরা শুধু আমার ক্ষিদেটাকেই মারাত্মক রকম জাগিয়ে দিয়েছ !

(অলকা হেসে পা বাড়ালেন)

—তিন—

[প্রথম দৃশ্যের মতো। কাল রাত্রি। শুধু সেই বিছানাটিতে রামকান্ত রায় শুয়ে আছেন। তিনি অসুস্থ। এ তাঁর মৃত্যুশয্যা।
পাশে তারিণী। মাথার কাছে বসে অর্ধাবগুণ্ঠিতা অলকা বাতাস করছেন।]

তারিণী ॥ উমা—উমা—(ঢুকলেন) ওষুধটা হয়ে গেছে মা ?

উমা ॥ হাঁ মা—এখুনি নিয়ে আসছি। (চলে গেলেন)

রামকান্ত ॥ কিসের ওষুধ ?

তারিণী ॥ কবিরাজ মশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, খেলে শ্বাসকষ্টটা কমে যাবে।

রামকান্ত ॥ শ্বাসকষ্ট ! না তারিণী—ওষুধে আর দরকার নেই। লজ্জা-অপমানের চাপে বুকটা আমার গুঁড়িয়ে গেছে। আমায় মরতে দাও—মরতে দাও তোমরা !

তারিণী ॥ এখন চুপ করো তো একটু। (একটা খল-নুড়িতে ওষুধ নিয়ে এলেন) বিপদ যিনি দিয়েছেন, তিনিই উদ্ধার করবেন। (ওষুধটা মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন) নাও নাও—

[রামকান্ত খল-নুড়িটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন]

রামকান্ত ॥ মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ ? সব বুঝেও আমার ভুল বোঝাতে চাও তুমি ? উদ্ধারই যদি করতেন, তাহলে এই বুড়ো বয়েসে বাকি খাজনার দায়ে অমন করে আমায় জেলে যেতে হত না ! অমন করে লোকের সামনে আমার উঁচু মাথা মাটিতে লুটিয়ে যেত না ! আজ আমারি ঋণের দায়ে জগৎকে অমন ভাবে মেদিনীপুরের জেলে পচে মরতে হত না। তারিণী, রায়রায়ান কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর হয়ে যে মুহূর্তে জেলখানার জল আমায় মুখে দিতে হয়েছে—তখুনি আমার আত্মহত্যা করা উচিত ছিল !

তারিণী ॥ কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। আজ দুঃসময় এসেছে, আবার সুদিন ফিরে আসবে।

রামকান্ত ॥ তারিণী, কপাল নয়, তোমার বাবার অভিশাপ! বিধর্মী ছেলের পাপে সোনার সংসার আমার রসাতলে গেল! (উত্তেজিত) আরো যাবে—আরো যাবে! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পথে পথে তোমাদের ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে!

তারিণী ॥ অদৃষ্ট যদি তেমন হয়, তাই হবে। কিন্তু যে বিধর্মী ছেলের জন্যে তোমার এত ভয়—সে তো আজ সংসারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখে না। (উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন) নিজের ভাগ্য নিয়ে সে দূর বিদেশে চলে গেছে। পশ্চিমে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তবু কেন নিমিত্তের ভাগী করছ তাকে ?

রামকান্ত ॥ চমৎকার তোমার যুক্তি তারিণী! বিদেশে চলে গেছে বলেই কি সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে তার? তুমি জানো না—কিন্তু সব কথাই তো আমার কানে আসে। সামনে তবু খানিক চক্ষুলজ্জা ছিল তার। এখন দূরে সরে গিয়ে সে পুরোপুরি ম্লেচ্ছ হয়ে উঠছে। জাতিভেদ মানে না, খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই—ধর্মের বিরুদ্ধে সমানে বিষ ছড়িয়ে চলেছে সে! এত বড় অন্যায়ের ভার মা বসুন্ধরাও সইতে পারেন না তারিণী—রায়রায়ান বংশ কোন ছার! সর্বনাশ আসছে—মহাপ্রলয় আসছে! বংশের সেই ভরাডুবি দেখবার আগেই তোমরা আমায় মরতে দাও! দোহাই তোমাদের, মরতে দাও আমাকে!

তারিণী ॥ (শান্ত কঠিন কণ্ঠে) এই যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তাহলে একটা উপায় তো এখনো আছে।

রামকান্ত ॥ কী উপায় ?

তারিণী ॥ ত্যাজ্যপুত্র করো মোহনকে। চুকিয়ে দাও সম্পর্ক। তার পাপ নিয়ে সংসার থেকে চিরদিনের মত বিদায় হোক।

রামকান্ত ॥ ত্যাজ্যপুত্র! সে কথা কি কতবার আমিও ভাবিনি? কিন্তু মা হয়ে তুমি তা সইতে পারবে তারিণী?

তারিণী ॥ পারব। সন্তানের চেয়ে বংশের মর্যাদা আমার কাছে অনেক বড়।

রামকান্ত ॥ কিন্তু—কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র করলেও সে যে এই বংশেরই সন্তান! আমার রক্ত তার শরীরে! সেই রক্তের পথ বেয়েই আসবে বিষ—জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। নিস্তার নেই—নিস্তার নেই তারিণী! না, ত্যাজ্যপুত্র করেও কোনো ফল হবে না!

তারিণী ॥ তবে তুমি কী করতে চাও?

রামকান্ত ॥ কিছুই না—কিছুই না! আমরা বৈষ্ণব—নারায়ণের পায়ে সব নিবেদন করে দিয়েছি। যা তাঁর ইচ্ছে, তাই হবে! কার বিচার করব আমি—কাকে ত্যাজ্যপুত্র করব? আজ সংসারকে যিনি শাস্তি দিচ্ছেন—কাল তোমার ছেলেও তিনি বাদ দেবেন না।

তারিণী ॥ তাই যদি বুঝে থাকো, তাহলে স্থির হও। তাঁরই ওপরে ছেড়ে দাও সব।

রামকান্ত ॥ চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি কই? চিন্তা তো একটা নয়! জগৎ জেলে—রামলোচন একেবারে নাবালোক। যে ঝড় আসছে, তার মুখে কে হাল ধরবে? আমার মৃত্যুর পরে কে বাঁচিয়ে রাখবে বংশের কুল-মান-মর্য্যাদা? তারিণী—আমি চলেছি। যাওয়ার আগে তুমি আমার একটা কথা রাখো—শেষ মুহূর্তে আমায় ভরসা দাও—

(তারিণীর হাত চেপে ধরলেন)

তারিণী ॥ ওগো অমন করছ কেন? (ব্যাকুল হয়ে) তুমি যা হুকুম করবে তা না মেনে কি আমি পারি?

রামকান্ত ॥ তাহলে কথা দাও, আমি যখন থাকব না, তখন এই হতভাগা সংসারকে রক্ষা করবার দায় তুমি নেবে? (তারিণী নিরুত্তর) বলো—বলো! তুমি ছাড়া এ দুঃসময়ে আমার কেউ নেই। বলো আমার সঙ্গে সহগমন করে সারা পরিবারটাকে তুমি ভাসিয়ে দিয়ে যাবে না! সমস্ত দুর্বিপাকের মধ্যেও রায়রায়ান বংশকে তার মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে? বলো তারিণী, বলো?

তারিণী ॥ সধবার সিঁদুর মাথায় নিয়ে সতীস্বর্গে যাবার সৌভাগ্য তুমি আমায় দিলে না! তা হোক, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। আমার বুকের রক্ত দিয়েও বংশের মান আমি বজায় রাখব!

রামকান্ত ॥ আঃ! (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন) তারিণী, তারিণী—এইবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!

—চার—

[রামকান্ত রায়ের বাড়ির উঠোন। তিনদিকে দরদালান—মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি জুড়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে।

জিনিসপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। দুজন পুরোহিত অভিনিবেশ সহকারে কলার ডোঙা কাটছেন। বৃষোৎসর্গের একটা খুঁটি এক কোণায় পোতা আছে। প্রাঙ্গণের ডানদিকে রাজরাজেশ্বরের মন্দির। বাঁদিক থেকেই চরিত্রগুলি আসবে এবং বাঁদিক দিয়েই বেরিয়ে যাবে।

আগের দৃশ্যের কিছুদিন পরের কথা। রামকান্ত রায় লোকান্তরিত হয়েছেন। আজ তাঁরই শ্রাদ্ধের আয়োজন। নেপথ্য থেকে মধ্যে মধ্যে কলকণ্ঠ শোনা যাবে:

—কই হে তোমাদের রসগোল্লার ভিয়ান নামল?

—কলাপাতা ওদিকে—ওদিকে—

এগুলি থেকে থেকে শোনা যাবে অনিয়মিত ভাবে—তা ছাড়া অবিচ্ছিন্ন অর্থহীন কোলাহল—পটভূমি সৃষ্টি করার জন্যে।

[সময়: ১৮০৩ সাল—জুন মাস। বেলা: আন্দাজ গোটা দশেক]

প্রথম ॥ লক্ষণ যে খুব ভালো ঠেকছে না হে ন্যায়রত্ন!

দ্বিতীয় ॥ কেন, কী হল?

প্রথম ॥ জেনে শুনেও যে ন্যাকা সাজছ! রামনগরের সমাজপতিরা কী বলে বেড়াচ্ছে শোনোনি? বিধর্মী মেজবাবু যদি বাপের শ্রাদ্ধ করেন তাহলে কেউ এ উপলক্ষে অন্ন গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয় ॥ আরে রেখে দাও—রেখে দাও ওসব। রায়রায়ানদের অবস্থা আজ যেমনই হোক, বনেদীয়ানা তো আছেই! ভোজের আয়োজন আর দান-সামিগ্রীর বহর দেখলে মাথা ঘুরে যাবে সকলের। সুড়-সুড় করে পাতে এসে বসতে পথ পাবে না।

প্রথম ॥ না হে, ব্যাপারটা এত সহজ হবে না। রামজয় বটব্যাল তো তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে চারদিক। আমরা শ্রাদ্ধ করতে এসেছি—শেষ পর্যন্ত আমাদের ধোবা-নাপিত বন্ধ না করে।

দ্বিতীয় ॥ মা ঠাকরুণ জানেন এসব ?

প্রথম ॥ জানেন না ? অমন বুদ্ধিমতী—অমন বিচক্ষণ—এ খবর কি আর তাঁর কানে আসতে বাকী থেকেছে ?

দ্বিতীয় ॥ মেজবাবুকে কিছু বলেছেন নাকি ?

প্রথম ॥ কিছুই তো বুঝছি না। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। মেজবাবুও সেই যে পশ্চিম থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছেন—এক হবিষ্যির সময় ছাড়া বাইরে পর্যন্ত আসেন না। মার সঙ্গে কথাবার্তা অবধি হয়েছ কিনা সন্দেহ। আমার কিন্তু সুবিধে মনে হচ্ছে না ন্যায়রত্ন! শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

দ্বিতীয় ॥ কপাল ভাঙলে এমনিই হয়! বাকী খাজনার দায়ে জেল খেটে সেই অপমানে কর্তা মারা গেলেন। সে টাকার জামিন হয়ে বড়বাবু এখনো হাজতে পচছেন। মেজ ছেলের এই বিপরীত বুদ্ধি! এত শোকে-তাপে মা ঠাকরুণ যে কী করে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন, তাই আশ্চর্য!

প্রথম ॥ মা ঠাকরুণকে তুমি এখনো চেনোনি ন্যায়রত্ন! পাথরের মতো শক্ত মানুষ! দরকার হলে—(হঠাৎ থেমে গিয়ে) ওই যে—নাম করতে করতেই আসছেন। বাঁচবেন অনেক দিন।

দ্বিতীয় ॥ যা শান্তিতে আছে—অনেকদিন বাঁচাটা বড় সুখের নয় ওঁর পক্ষে।

প্রথম ॥ চুপ—চুপ!

(তারিণী প্রবেশ করলেন। শোকশীর্ণা বিধবা। মুখে-চোখে স্থির সংকল্পের দ্যুতি।)

তারিণী ॥ আপনাদের আর কত দেরী স্মৃতিতীর্থ মশাই ?

প্রথম ॥ এদিকে সব তৈরি মা। এখনি কাজে বসতে পারবেন।

তারিণী ॥ দান-দক্ষিণার যা ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কর্তার অমর্যাদা হবে না—কী বলেন ?

প্রথম ॥ সে কথা আর বলতে মা! রায়রায়ান বাড়ির কাজ—তার ওপর অমন মানী লোকের শ্রাদ্ধ! কিন্তু (একটু গলা খাঁকারি দিয়ে) ব্যাপারটা কী জানেন মা? রামনগরের সমাজপতিরা—

তারিণী ॥ (বাধা দিয়ে) শুনেছি।

দ্বিতীয় ॥ আমাদের ভয় হচ্ছে যদি কোনোরকম গোলমাল—

তারিণী ॥ (সংক্ষেপে) কিছু হবে না। তাঁর শ্রাদ্ধে কোথাও একটু ফাঁক আমি রাখব না।

প্রথম ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাহলেই নিশ্চিন্ত। তবে এই—নানারকম শুনছিলাম কিনা—

(মুণ্ডিতশির, উত্তরীয়ধারী রামমোহনের প্রবেশ। তাঁকে দেখে স্মৃতিতীর্থ থেমে গেলেন। রামমোহন একবার নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁদের এবং পরে সমস্ত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন মা-র কাছে)

রাম ॥ সময় তো প্রায় হয়ে এল মা! এবার বসতে পারি?

প্রথম ॥ আপনি আসুন। আমাদের সব তৈরি।

(শ্রাদ্ধের কিছু কিছু উপকরণ নিয়ে উমা এবং অলকা প্রবেশ করলেন। সাজিয়ে দিলেন।)

রামমোহন ॥ তাহলে আদেশ দাও মা।

তারিণী ॥ আদেশ দিলাম বাবা। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এবার তোমার হাতে জলগণ্ডুষ পেয়ে ওঁর জ্বলে-যাওয়া বুকটা তৃপ্তি পাক।

(স্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল, উমা ও অলকা আঁচলে চোখ মুছলেন)

রামমোহন ॥ আমি তাহলে—(আসনের দিকে এগোতে গেলেন)

তারিণী ॥ একটু দাঁড়াও—

(রামমোহন দাঁড়ালেন)

শোনো। তোমার দাদা রয়েছে। সেইজন্যে তোমার অগ্রজের অধিকার—তুমিই পিতৃশ্রাদ্ধ করতে চলেছ। বংশের সমস্ত বিধি

মেনে—তার মর্যাদা রেখে তবেই এ কাজ তুমি করতে পারো। তাই আগে তোমার আরো কিছু কর্তব্য শেষ করে নাও।

রামমোহন ॥ কী কর্তব্য মা?

তারিণী ॥ এগিয়ে যাও ওই রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। (মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দিলেন) এতদিন ধরে যা বলেছ, যা করেছ, মার্জনা চাও তার জন্যে।

রামমোহন ॥ মা!

তারিণী ॥ শ্রদ্ধাভরে রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলো—জীবনে আর কখনো স্বেচ্ছাচার করবে না!

রামমোহন ॥ স্বেচ্ছাচার তো আমি করিনি মা। যে অপরাধ আমার নয়, তারই জন্যে কেন তুমি আমায় ক্ষমা চাইতে বলছ?

তারিণী ॥ তর্কের সময় নয় মোহন। শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়েই তুমি পিতৃতর্পণে বসবে। এ আমার আদেশ।

রামমোহন ॥ আদেশ! এ অন্যায় আদেশ মা!

(তারিণীর মুখ লাল হয়ে উঠল। অলকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন রামমোহনের কাছে)

অলকা ॥ (চাপা গলায়) যাও, ঠাকুরপো যাও। এ সময় আর মাকে ক্ষেপিয়ে কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না!

ন্যায়রত্ন ॥ মেজবাবু, যান। আমাদের সব তৈরি। আপনি এসে বসলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।

রামমোহন ॥ কিন্তু—

অলকা ॥ এর মধ্যে আবার কিন্তু কী! যাও শিগ্‌গির!

রামমোহন ॥ যা আমি বিশ্বাস করি না—

অলকা ॥ তুমি বড় একগুঁয়ে মানুষ ঠাকুরপো! বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে এতে? (চাপা গলায়) শুধু দুটো মুখের কথা খরচ করলেই মা যদি খুশি হন—

রামমোহন ॥ হাঁ যাচ্ছি—

(ডানদিকে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর—)

রাজরাজেশ্বর, রাধারাণী, তোমরা আমার মায়ের ইষ্টদেবতা। আমি তোমাদের স্বীকার করি না—

তারিণী ॥ (বজ্রাহত) মোহন!

রামমোহন ॥ না—স্বীকার করি না! কিন্তু মা আদেশ করেছেন বলে তোমাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি! (নমস্কার করলেন)

অলকা ॥ (আর্তস্বরে) কী হচ্ছে ঠাকুরপো!

রামমোহন ॥ (ভ্রূক্ষেপও করলেন না) কোনো অপরাধ আমি কারো কাছে করিনি। তবু মা যখন বলেছেন, তখন তোমাদের কাছে মার্জনা চাইছি আমি।

(সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শুধু দেখা গেল, অসহ্য ক্রোধে তারিণী থর থর করে কাঁপছেন। রামমোহন ফিরে তাকালেন)

এইবার আমি শ্রাদ্ধে বসতে পারি মা?

(তারিণীর ঠোঁট নড়ে উঠল)

তারিণী ॥ না! পারো না! কোনোদিন পারবে না!

অলকা ॥ মা!

তারিণী ॥ (চীৎকার করে) না—না! নাস্তিক, কুলাঙ্গার—এ শ্রাদ্ধে তোমার অধিকার নেই। আর—আর (কাঁপতে লাগলেন) এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তেই এ বাড়ি থেকে তুমি বেরিয়ে যাবে!

ন্যায়রত্ন ॥ কী হচ্ছে মা ঠাকরুণ! শান্ত হোন।

তারিণী ॥ শান্ত হব! এর পরেও শান্ত হব! এ বংশের সম্মানের ভার স্বামী অন্তিম সময়ে আমারই হাতে দিয়ে গেছেন। মোহন—আমার আদেশ, এখুনি তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে!

উমা ॥ (রামমোহনের কাছে গিয়ে কাতর ব্যাকুল গলায়) ওগো—কী করছ? যাও, মার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও!

রামমোহন ॥ হাঁ—ক্ষমা চাইব। (তারিণীর দিকে এগিয়ে গিয়ে) কোনো অন্যায় আমি করিনি মা। কিন্তু নিরুপায় হয়েই তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছি—সেজন্যে আমায় ক্ষমা করো।

তারিণী ॥ (মুখ ফিরিয়ে) আমি! আমি ক্ষমা করবার কে! বংশের অপমান—দেবতার অমর্যাদা—আমার ক্ষমা করবার তো অধিকার নেই! চলে যাও—চলে যাও তুমি—

রামমোহন ॥ তাই যাচ্ছি। সত্যের অনুরোধে আজ তোমাকেও আমায় ছাড়তে হল মা। সে-জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু একটা কথা বলে যাই। পিতৃশ্রাদ্ধ আমি করবই। এ বাড়ীতে না হোক—পৃথিবীতে জায়গার অভাব আমার হবে না। তোমাদের কোনো কুসংস্কারই আমার সে শ্রাদ্ধাধিকার কেড়ে নিতে পারবে না—

(রামমোহন চলে গেলেন)

অলকা ॥ ঠাকুরপো!—ঠাকুরপো—

তারিণী ॥ (দৃঢ় কণ্ঠে) যেতে দাও অলকা। ওর যাওয়াই দরকার!

(উমা আঁচলে মুখ ঢাকলেন। তারিণী শ্রাদ্ধের আসরের দিকে এগোলেন)

স্মৃতিতীর্থ মশাই, সর্বকনিষ্ঠ লোচনই তার পিতৃশ্রাদ্ধ করবে। আমি এখুনি তাকে ডেকে আনছি—

—পর্দা পড়ল—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—এক—

[কয়েক বৎসর পরে।

শ্মশান।

পেছনে কিছু দূরে জগমোহনের চিতা সাজানো হচ্ছে। সাত আটজন শববাহীকে দেখা যাচ্ছে ওদিকে, তারা চিতা সাজানোয় ব্যস্ত। ঢাক কাঁধে দুজন ঢাকী। দুজনের হাতে দুটো বড় বড় ধুনুচি—তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। যন্ত্র-চালিতের মতো প্রবেশ করলেন অলকা—লাল শাড়ী পরা—এলোমেলো রুক্ষ চুল। সমস্ত কপালে তাঁর সিঁদুর লেপা। যেন ভৈরবীর মূর্তি। তারিণী এবং উমা তাঁকে অনুসরণ করলেন।]

তারিণী ॥ (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) যাও মা! ভাগ্যবতী তুমি! স্বামীর চিতায় সতী হয়ে জন্ম-এয়োতি হও। অক্ষয় স্বর্গ হোক তোমার!

উমা ॥ (অলকাকে জড়িয়ে ধরলেন—কান্নাভরা গলায় ডাকলেন) দিদি!

(অলকা জবাব দিলেন না—বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। অর্থহীন শূন্য তাঁর দৃষ্টি।)

তারিণী ॥ এ সময় আর মায়া বাড়িয়োনা মেজবৌ! ওর সৌভাগ্যের পথ চোখের জলে পিছল করে দিয়ো না। বাপের মতোই অনেক জ্বালায় জগৎ আমার জ্বলে মরেছে। মা হয়ে ইহলোকে আমি কিছুই করতে পারিনি, পরলোকে ওকে তুমি শান্তি দিয়ো বৌমা!

(অলকা জবাব দিলেন না)

উমা ॥ মা, বড় ঠাকুর চলে গেলেন, আজ দিদিও—(কেঁদে ফেললেন)

তারিণী ॥ কত পুণ্য করলে মেয়েরা সতী হয়—একি কাঁদবার জিনিষ মেজ বৌ? আজ ওর পিতৃকুল-শ্বশুরকুল সব ধন্য হল। আশীর্বাদ করি বড় বৌমা, ঠাকুর তোমায় শক্তি দিন। (অলকা তেমনি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন) মেজ বৌ, এসো।

উমা ॥ যাই মা—

(কাঁদতে কাঁদতে অলকার পায়ের ধুলো নিলেন—অলকা কাঠের মত এক খানা হাত তুলে মুহূর্তের জন্যে উমার মাথায় ছোঁয়ালেন।)

তারিণী ॥ এসো মেজ বৌ—

তারিণী পেছনে একবারও না তাকিয়ে এগিয়ে চললেন। উমা তাঁকে কয়েক পা অনুসরণ করে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ফেললেন। তারিণী ফিরে তাকালেন, তারপর সস্নেহে তার হাত ধরলেন)

এসো—

(তারিণী ও উমা চলে গেলেন। অলকা দাঁড়িয়ে রইলেন মূর্তির মতো। স্তব্ধতার কাটল। পুরোহিত এগিয়ে এলেন)

পুরোহিত ॥ মুখাগ্নি হয়ে গেছে। এবার আপনি আসুন—

অলকা ॥ (যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন) অ্যা ?

(দেখা গেল পিছনে চিতা জ্বলে উঠেছে)

পুরোহিত ॥ আপনি আসুন—

অলকা ॥ ওঃ! চলুন—

পুরোহিত ॥ এই কুশ নিন—

(অলকা নিলেন)

পুবমুখী হয়ে দাঁড়ান মা—(যন্ত্রের মতো ঘুরে দাঁড়ালো অলকা) এবার সংকল্প পড়ুন—(পুরোহিত পড়ে যেতে লাগলেন, অলকা সঙ্গে সঙ্গে বলে চললেন) কার্ত্তিকে মাসি, কৃষ্ণে পক্ষে, ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রা শ্রীমতী অলকামঞ্জরী দেবী অরুন্ধতী সমাচারত্ব-পূর্বক স্বর্গলোক মহীয়মানত্ব মানবাধিরণকলোমসম সংখ্যাব্দাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-ভর্তৃ-সহিত মোদমানত্ব—

(একটি লোক দৌড়ে এসে পুরোহিতের কানে কানে কী বলল; পুরোহিত চমকে উঠল। চাপা স্বরে বললে)

অ্যা আসছে—নৌকো থেমেছে ঘাটে। তবে আর দেরী নয়,

মন্ত্র এই পর্যন্তই রইল। (জোরে অলকাকে) মা, সংকল্প হয়ে গেছে। বলুন, 'ভর্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে'—

(অলকা প্রতিধ্বনি করলেন)

এবার অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমিজল-হৃদয়াবস্থিত অন্তর্যামিপুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা—

(লোকটি আবার কানে কানে কী বলল; পুরোহিত ব্যস্ত হয়ে)

হ্যাঁ—হ্যাঁ—এদের সাক্ষী করে আপনি চিতায় আরোহণ করুন—শবকে আলিঙ্গন করে বসুন। আর দেরী নয় মা—আর দেরী নয়—আসুন—

(অলকা চিতার দিকে চলে গেলেন; জনতার ভিড় তাঁকে ঘিরে ধরল। আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল জনতার ওদিক থেকে।)

পুরোহিত ॥ (ভীড় ঠেলে বেরিয়ে চীৎকার করে) ওরে বাজা—বাজা। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী! স্বর্গের সিংহদ্বার খুলে গেছে, সতী পতির সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন, বাজা—বাজা—

(উদ্দাম শব্দে ঢাক বেজে উঠল)

শববাহীরা ॥ (সমস্বরে) জয়, সতী অলকামঞ্জরীর জয়—

পুরোহিত ॥ বাজা—বাজা—আরো জোরে বাজা—

(প্রচণ্ড রোলে ঢাক বাজতে লাগল। ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। উঠতে লাগল ঘন ঘন জয়ধ্বনি। সবটা মিলিয়ে এক বীভৎস পরিবেশ রচিত হল। হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এলেন অলকা—)

অলকা ॥ পারব না—আমি পারব না—

শবযাত্রীরা ॥ (সমবেত কোলাহল) পালায়—পালায়—সতী পালায়—

পুরোহিত ॥ মা, কী করছেন, কী করছেন! সংকল্প করে—(হাত চেপে ধরলেন অলকার)।

অলকা॥ (হাত ছিনিয়ে নিয়ে) জানি না, কিছু জানি না। আমার সন্তানকে ফেলে আমি মরতে পারব না। আমি শুনতে পাচ্ছি সে আমার জন্যে কাঁদছে। (আর্ত চীৎকারে) বাবা—আমি আসছি—আমি আসছি—তোকে ছেড়ে কোথাও আমি যেতে পারব না—

(অলকা ছুটে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ থেকে)

পুরোহিত॥ (পাগলের মতো) ধর্—ধর্—পালাতে দিস্ নি। (দু' তিনজন শববাহী লাঠি নিয়ে ছুটল) ওদিকে বোধ হয় ম্লেচ্ছটা এসে পড়ল—সব পণ্ড হয়ে যাবে! ধর্—ধর্—ধর্—

নেপথ্যে অলকার বুকফাটা আর্তনাদ॥ খোকা—খোকা আমার—উঃ!

পুরোহিত॥ (চেঁচিয়ে) বাজা, যত জোরে পারিস্, বাজা। সতী স্বর্গে যাচ্ছেন—স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন! অক্ষয় পুণ্য, তিন কুলের বৈকুণ্ঠ লাভ—

(শববাহীরা ধরাধরী করে অচেতন অলকাকে নিয়ে এল। মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে)

যাও—নিয়ে যাও—! ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সতীকে স্বর্গে যেতেই হবে!

[অলকাকে নিয়ে সকলে চিতার দিকে অগ্রসর হল। ঢাকের উতরোল শব্দ কান বধির করে দিতে লাগল—ধুপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। দূর থেকে দেখা গেল সকলে চিতাকে ঘিরে আছে—তাদের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা উঠছে]

পুরোহিত॥ (চীৎকার করে) রায়বংশ ধন্য হল—দেবী সতীলোকে গেলেন!

শববাহীরা॥ জয় সতী অলকমণির জয়—

[ঢাকের শব্দ। ধুপের ধোঁয়া—জয়ধ্বনি। কিছুক্ষণ।]

দ্রুত রামমোহন প্রবেশ করলেন]

রামমোহন॥ বৌঠান—বৌঠান—

[থমকে থেমে পড়লেন—শববাহীরা ইতস্ততঃ নড়ে চড়ে দাঁড়ালো, এ ওর কানে কানে গুঞ্জন করল। পুরোহিত আস্তে এগিয়ে এলেন।

রামমোহন ততক্ষণ মাটিতে বসে পড়েছেন দুহাতে মুখ ঢেকে। তারপর কান্নাভরা গলায় বললেন]

বৌঠান, ছেলেবেলা থেকে তোমায় যে মায়ের মত দেখে এসেছি! সেই তুমি এমন করে ছেড়ে গেলে! এতদূর থেকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলাম, তবু—তোমায় বাঁচাতে পারলাম না! (কেঁদে ফেললেন)

পুরোহিত ॥ দুঃখ করে কী করবেন মেজবাবু! স্বেচ্ছায় সতী স্বর্গে গেলেন—হাসিমুখে চিতায় উঠলেন। আহা, আজ বংশ পবিত্র হল—গ্রাম ধন্য হল—

রামমোহন ॥ মিথ্যে—মিথ্যে! এ হত্যা—ধর্মের মদ খাইয়ে বর্বরের মতো নারীহত্যা! এতে বংশ উজ্জ্বল হবে না—সমস্ত হিন্দু ধর্মের মাথার ওপর বাজ পড়বে!

(তীব্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন—প্রায় চীৎকার করে বললেন কথাগুলো)

পুরোহিত ॥ আপনি ধর্মাধর্ম মানেননা মেজবাবু, তাই—

রামমোহন ॥ চুপ করুন! শয়তান আপনারা—আপনারা খুনী! কিন্তু জানবেন—এ আর চলবেনা! আজ এই প্রতিজ্ঞা আমি করে গেলাম—বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এ হত্যাকাণ্ড আমি বন্ধ করবই। দেশ থেকে এ নারীমেধের পৈশাচিক আনন্দ আমি মুছে দেব! শুনে রাখো বৌঠান, আজ থেকে এই আমার জীবনের সাধনা। সতীদাহ বন্ধ আমি করবই—আমি করবই—

(উন্মত্তের মতো ছুটে চলে গেলেন)

পুরোহিত ॥ বন্ধ করবে—সতীদাহ বন্ধ করবে! হা! হা! হা—

(পাগলের মতো হেসে চললেন)

—দুই—

[রায়রায়ান রামকান্তর লাঙুলপাড়ার বাড়ি। সকাল। বারান্দায় তারিণী মালা জপ করছেন। একখানা আসনে বসেছেন তিনি। দেওয়ান প্রবেশ করলেন। বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন]

দেওয়ান ॥ তাহলে প্রজাদের কী করব মা ?

তারিণী ॥ খাজনা না দেয়, উচ্ছেদ করুন।

দেওয়ান ॥ আজ্ঞে সে তো বটেই, সে তো বটেই। ইচ্ছে করলেই সেটা করা যাবে। কিন্তু—

তারিণী ॥ (ভ্রুকুঞ্চিত করলেন) আবার কিন্তু কী ?

দেওয়ান ॥ মানে বলছিলাম কী—এবার ওদিকটাতে অজন্মা হয়েছে, তাই কিছু মাপ-টাপ—

তারিণী ॥ মাপ ! খাজনা মাপ করলে আমার কী করে চলবে ? কত কষ্ট করে সব সামলাতে হচ্ছে, তা কি আপনি জানেন না ? এর পরে খাজনা মাপ করলে লাট পাঠাবেন কোথা থেকে ? সব শুদ্ধু তখন নীলেমে চড়বে।

দেওয়ান ॥ বুঝছি তো সব ! (মাথা চুলকে) তা, লাটের খাজনা হয়ে যাবেই একরকম করে। কথাটা কী জানেন মা ? এরকম অবস্থায় কর্তা কিছু মাপ করেই দিতেন, তাই আর কি—

তারিণী ॥ দেওয়ানজী মশাই !

(তীব্র স্বর শুনে দেওয়ান চমকে উঠলেন)

দেওয়ান ॥ আজ্ঞে ?

তারিণী ॥ আমার স্বামী কী করতেন না করতেন সে আলোচনায় আজ আর দরকার নেই। কিন্তু ভার যখন আমার হাতে তিনি দিয়ে গেছেন, তখন আমি যা করব তাই হবে।

দেওয়ান ॥ যদি কোনো গণ্ডগোল হয় ?

তারিণী॥ ঘর ভেঙে দেবেন। লাঠিয়াল পাঠাবেন। আগুন লাগিয়ে দেবেন। বুঝেছেন ?

(নবকিশোর প্রবেশ করল)

নব॥ কেমন আছো খুড়িমা ?

তারিণী॥ নবকিশোর যে! এসো—এসো—(নবকিশোর একপাশে বারান্দায় বসল) দেওয়ানজী মশাই, তাহলে আপনি এখন আসুন। যা বললাম, তাই করবেন।

(দেওয়ান চলে গেলেন)

তারপর, খবর কী নব ?

নব॥ এই একরকম চলে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার কী খুড়িমা? নিজেই বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করছ নাকি ?

তারিণী॥ দেখছেন গৃহদেবতা রাজরাজেশ্বর। আমি শুধু তাঁর সেবায়েৎ।

নব॥ ওসব বড বড় কথা আমি বুঝিনে খুড়িমা! চাষাভূষো মানুষ—মাঠে দাঁড়িয়ে চাষবাসের তদারক করি, আমার মাথায় ওসব বিশেষ ঢোকেও না। আমি বলছিলাম, তুমি মেয়ে মানুষ—এ বয়েসে কোথায় তীর্থধম করবে—তা নয় এসব কী কচকচি নিয়ে পড়েছো! কুড়োজালিতে তো হরিনাম জপছো না—কষছো জমিদারী প্যাঁচ! ছাড়ো—ছাড়ো এসব—

তারিণী॥ কী করে ছাড়ব নব? আশা ছিল লোচন বড় হয়ে উঠলে তার হাতেই সব তুলে দেব। কিন্তু রায়রায়ান বংশের কপালগুণে নারায়ণ তাকে তো আগেই পায়ে টেনে নিয়েছেন! কার ওপর ছাড়ব এ সমস্ত ? তীর্থ-ধর্ম! হ্যাঁ, ভেবেছিলাম একবার শ্রীক্ষেত্রে যাব, জন্মের সাধ মিটিয়ে দর্শন করে আসব নীলমাধবকে। কিন্তু তাও বুঝি আর হল না। যে বোঝা স্বামী আমার ওপর তুলে দিয়ে

গেছেন—তার ভার বয়েই বুঝি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমায় কাটিয়ে যেতে হয়।

নব ॥ ইচ্ছে করে এই ভোগান্তি ভুগছ খুড়িমা। অনেক তো হল—আর কেন? এবার মিটিয়ে ফেল!

তারিণী ॥ মেটাব! কার সঙ্গে?

নব ॥ তাও কি আমায় বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি? অমন দিকপাল ছেলে তোমার—দেশজোড়া নাম এখন! কালেক্টার ডিগ্‌বী সাহেবের সঙ্গে ঘুরে আর ব্যবসা বাণিজ্য করে দুপয়সা কামিয়েও নিয়েছে। রংপুরে গিয়ে আমি তো দেখেছি সায়েবদের কাছে তার খাতির কত! দেশী লোকের মধ্যে একা রামমোহনই সাহেবদের সঙ্গে সমানে আদর পায়! কোথায় এমন ছেলের হাতে সব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে তা নয়—মিথ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছ? সে রইল রাধানগরে গিয়ে আলাদা বাড়ি করে আর তুমি এখানে ভূতের ব্যাগার খেটে মরছ! কোনো দরকার আছে এ-সবের?

তারিণী ॥ (তীব্রস্বরে) নব!

নব ॥ (চমকে) বলছিলাম কি, একটা মিটমাট—

তারিণী ॥ মিটমাট? কার সঙ্গে মিটমাট? যেটুকু বাকী ছিল, সে পথ তোমরাই তো বন্ধ করে দিয়েছ! এই তুমিই কি রংপুর থেকে ফিরে এসে বলোনি যে মোহন আজকাল মাংস খাওয়া ধরেছে?

নব ॥ (বিব্রত হয়ে) ইয়ে—হ্যাঁ—তা বলেছিলাম বৈ কি। মানে কথাটা কী, ওখানে খেঁশারীর ডাল খেয়ে নাকি রামমোহনের রক্তে দোষ হয়েছিল, তাই—

তারিণী ॥ (থামিয়ে দিয়ে) এই বৈষ্ণব পরিবারে অসুখ বিসুখ সকলেরই করে—সে অসুখ সেরেও যায়। তার জন্যে কখনো অখাদ্য খাওয়ার দরকার হয় না!

নব ॥ এ-ও ভারী তাজ্জব কথা খুড়িমা। গোঁড়া শাক্তের ঘরের মেয়ে তুমি—মাংস খেয়েছে শুনে তুমিই বা এমন ক্ষেপে যাও কেন?

তারিণী ॥ আজ আমি বৈষ্ণবেরই স্ত্রী। মোহনও বৈষ্ণবের ছেলে। শুধু তাই নয়। কিন্তু তুমিই কি একথাও বলোনি নব, যে রংপুরে মোহন তার নতুন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করে বেড়িয়েছে? কী এক পণ্ডিতের সঙ্গে বিস্তর ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে তাই নিয়ে?

নব ॥ আহা—আহা—সে তো আছেই। রংপুরের সেই গৌরীকান্ত ভট্‌চায লোকটাও এক উদ্দাম পাগল। আর তাছাড়া তুমি তো জানোই, এসব নিয়ে তর্ক করা রামমোহনের বরাবরের স্বভাব?

তারিণী ॥ আজ আমায় মিথ্যে ভোলাতে চেষ্টা করোনা নব। কত বড় আঘাত পেয়ে উনি মারা গেলেন সে কথা আমি ভুলিনি। ওঁর শ্রাদ্ধের সময় সে অপমান এখনো বুকের ভেতর আগুন হয়ে জ্বলছে। তারপর অসংখ্য খুঁটিনাটি ঘটনা—না নব, কিছুতেই না! সন্তান বলে যাকে স্বীকার করতে পারিনা, সেই বিধর্মী সম্পর্কে কোনো আলোচনাই আমি করবনা!

নব ॥ তোমার পাথরের প্রাণ খুড়িমা! তাছাড়া রামমোহনেরও তো সম্পত্তিতে অধিকার আছে। খুড়োমশাই তো সমানে তিন ভাইকেই সব উইল করে দিয়ে গেছেন—

তারিণী ॥ তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু আমি করবনা। বাপের শ্রাদ্ধের মর্যাদা পর্যন্ত যে রাখল না, বাপের সম্পত্তিতে এক তিলও তার অধিকার নেই! যতদিন আমি বাঁচব, বিষয়ের একটি পয়সা ছুঁতে দেবনা তাকে!

নব ॥ আচ্ছা খুড়িমা, তুমি কী! অমন পণ্ডিত ছেলে তোমার, দেশ জোড়া নাম—

তারিণী ॥ হাঁ—দেশজোড়া নাম ব্রাহ্মণের ছেলে কালাপাহাড়েরও ছিল!

একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের সে মুখ উজ্জ্বল করেছিল হিন্দুর সর্বনাশ করে। নব, আমার কী ইচ্ছে করে জানো? যদি আজ লাঠিয়াল পাঠিয়ে কুলাঙ্গারের মাথাটা শুদ্ধু—

নব॥ (সভয়ে) খুড়িমা! কী বলছ তুমি?

তারিণী॥ থাক, বিচার রাজরাজেশ্বর করবেন! তাঁর হাতে সুদর্শন চক্র আছে—ধর্মরক্ষাই তার কাজ।

(রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল এসে ঢুকলেন। প্রবীণ, বিচক্ষণ লোক। ঘরে ঢুকে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্তে একবার কাশলেন।)

তারিণী॥ আসুন বটব্যাল মশাই, কী মনে করে?

রামজয়॥ একটু কাজের কথা আছে মা। (নবকে) কেমন আছো নবকিশোর, ভালো তো?

নব॥ এতক্ষণ তো ভালোই ছিলাম। কিন্তু রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যালকে দেখলেই কেমন বুক কাঁপে। মনে হয়, কখন ভুলে কি অনাচার করে বসেছি—এখনি আমার হুঁকো-নাপিত বন্ধ হবে!

তারিণী॥ আঃ, কী হচ্ছে নব! বসুন বটব্যাল মশাই, বসুন।

রামজয়॥ বসব না মা, এখনো পূজা-আর্চা বাকী আছে। আমি বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিবেদনটা শেষ করে যাই!

নব॥ বটব্যালমশাই, কেউ কেউ খুব নিরীহের মতোই আসে। আবির্ভাবটা ধূমকেতুর মতন আকাশের একটি কোণায়, কিন্তু ফলং সর্বনাশং।

তারিণী॥ থামো নব! কী আবোল-তাবোল বলছ একজন মানী লোককে! কী বলতে চান আপনি।

রামজয়॥ বড়োই অপ্রিয় কথা বলতে এসেছি, মা। শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন।

তারিণী॥ না কষ্ট আমি পাবো না। জানি, কী আপনি বলতে এসেছেন। মোহন আপনাদের গাঁয়ের পাশে রাধানগরে গিয়ে বাড়ি করেছে। সেটা আপনারা পছন্দ করেন না, এইতো?

রামজয়॥ (বিনীত ভাবে) মা আমার সাক্ষাৎ অন্তর্যামী! কিছুই বলতে হয় না—শুনেই পেটের কথা আঁচ করে নেন। তা বাস রামমোহন করুক,—যেখানে ইচ্ছে সেখেনেই করুক। কিন্তু সমাজের বুকের মধ্যে বসে কী এসব?

নব॥ ধর্মকর্ম বুঝি বানচাল হতে বসেছে?

রামজয়॥ (উত্তেজিত হয়ে) তুমি ঠাট্টা করছ নবকিশোর, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে তাই! বাড়ি করেছেন লোক-বসতি ছেড়ে এক শ্মশানের মধ্যে। তা ভূতের ভয় তাঁর থাক বা না থাক আমাদের কিছু যায় আসে না। বাড়ির সামনে এক বেদী বানিয়ে তার গায়ে লিখেছেন: (ব্যঙ্গভবে) ওঁ তৎসৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্! সেইখানে বসে চোখ বুজে তপিস্যে হয়! আর যে যায়—তাকেই বুঝিয়ে দেন—দেবদেবী সবই মিথ্যে! ঈশ্বর এক—হিন্দু—মোছলমান—খেরেস্টান—সব এক!

নব॥ তা আমরাও দেশশুদ্ধ, সবাই আদা-নুন খেয়ে লেগে যাই না! চীৎকার করে বলতে থাকি: ঈশ্বর শুধু তেত্রিশ কোটি নয়—তিনলক্ষ তেত্রিশ কোটি! ওলাইচণ্ডী, ঘেঁটু দেবতা, বাঁশবনের ব্রহ্মদত্যি— শ্যাওড়া গাছের মেছো পেত্নী—সকলের পায়ে মাথা না খুঁড়লে অনন্ত নরক?

তারিণী॥ ছেলেমানুষি কোরোনা নবকিশোর। ভাইয়ের বাতাস তোমার গায়েও লেগেছে দেখছি, তাই দেবদেবী নিয়ে এসব রসিকতা করতে সাহস পাও! কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে জিনিসটা এত সহজে উড়িয়ে দেবার নয়!

রামজয় ॥ (মাথা নাড়তে লাগলেন) উড়িয়ে দেব কি মা! শুধু এই! দিনরাত বাড়িতে মোছলমান গিজ গিজ করছে। যত মোল্লার সঙ্গে বসে শাস্ত্রপাঠ চলছে! না আছে ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার—না আছে ধর্মকর্ম। শুনেছি, ফার্সীতে বইও লিখেছেন হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে। এমন লোক আশেপাশে থাকলে তো গাঁয়ে বাস করা—

তারিণী ॥ (চাপা হিংস্র গলায়) অসুবিধে হয়, গ্রাম থেকে ওকে তুলে দিন!

নব ॥ খুড়িমা!

তারিণী ॥ আপনারা যা ভালো মনে করেন—তাই করবেন বটব্যাল মশাই। আপনারা সমাজপতি, আপনাদের বিচারই শেষ কথা। আমার কিছুই বলবার নেই।

রামজয় ॥ করবার তো অনেক কিছুই আছে—শুধু আপনার ছেলে বলেই করিনি। যদি আপনার অনুমতি পাই—

তারিণী ॥ ধর্ম যেখানে বিপন্ন, সেখানে আমার অনুমতির কোনো দরকার নেই। তা সে যেই হোক। আর তাছাড়া তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই—একথা তো তুমিও জানো রামজয়!

রামজয় ॥ (মৃদু হাসলেন) যাক মা, নিশ্চিন্ত হলাম! ওইটুকুর জন্যেই আটকাচ্ছিল। দেওয়ান রামকান্তের বংশ বলেই এতদিন সয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার মত যখন পেলাম তখন দুদিনেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজ আসি তাহলে—

(বেরিয়ে গেলেন)

নব ॥ (সভয়ে) করলে কী খুড়িমা! ওকে উসকে দিলে! ওযে সাক্ষাৎ বিষধর সাপ! সুযোগ পেলেই যে ছোবল দেবে।

তারিণী ॥ (চোখ তুলে নন্দকিশোরের দিকে চাইলেন। চোখ দপ দপ করে উঠল) সব জেনেশুনে ইচ্ছে করে যে সাপের গর্তে হাত দেয় তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না নব—

(বেরিয়ে গেলেন। নবকিশোর বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

—তিন—

[রামমোহনের রাধানগরের বাড়ি।

রামমোহন এখন মধ্য-যৌবনে। স্ত্রী উমারও কিছু বয়েস বেড়েছে।

একখানা আসনে বসে কাঠের একটি ডেস্কে কী যেন লিখছেন রামমোহন। অত্যন্ত তন্ময়চিত্ত। থেকে থেকে মাথা তুলে কী ভাবছেন, আবার লিখে যাচ্ছেন। আশে-পাশে পর্বতপ্রমাণ বইয়ের স্তূপ।

উমা এসে নিঃশব্দে পাশে বসলেন।]

উমা॥ আজ সারাদিন কি তোমার ওই লেখা আর পুঁথি ঘাঁটা শেষ হবে না?

রামমোহন॥ সমুদ্রে যতই ডুব দিচ্ছি উমা, ততই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। এত জিনিস জানবার আছে, এত কথা বলবার আছে। মনে হচ্ছে, জীবনের পরমায়ু যদি হাজার বছর হত, তাহলেও শাস্ত্রের হাজার ভাগের এক ভাগও জানা হত না।

উমা॥ অত জেনে যে কী হচ্ছে তাও তো বুঝছি না। লাভের মধ্যে দেখছি শত্রু বাড়ছে।

রাম॥ (হাসলেন) তাই নিয়ম। অজ্ঞতার রাজ্যে আলো জিনিসটা চিরকাল দুঃসহ। সে আলো নিবিয়ে দিতে পারলেই লোকে নিশ্চিন্ত হয়।

উমা॥ আচ্ছা, তুমি কিছু না মানো—মেনো না। গায়ে পড়ে কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করতে আসছে না। কিন্তু ওসব অমন করে বলে লাভ কী? খামোখা লোক চটানো বই তো নয়!

রাম॥ সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পাওয়াটা মিথ্যেরই ছদ্মবেশ। মিথ্যেকে আমি প্রশ্রয় দেব না উমা! আমার কথা পৃথিবী শুদ্ধ, মানুষকে আমি জানাব। প্রচার করব—বইয়ের পর বই লিখব—প্রমাণ করব—

উমা॥ ওগো, আমার ভয় করছে! দোহাই তোমার—অনেক

এগিয়েছ, আর নয়! এইবারে থামো! বাড়ি ছাড়তে হয়েছে—যার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে, চারদিকে শত্রু! একা একা কেন তুমি এমন করে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ?

রাম ॥ (শান্ত স্বরে) যে দাঁড়ায়—সে একাই দাঁড়ায়। অনেক ঝড়-ঝাপটা তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে তবেই মাটিতে-পড়া মানুষগুলো দাঁড়াবার জোর পায়।

উমা ॥ কী যে তুমি করছ, তুমিই জানো। তোমার সবই বিদ্ঘুটে! বাড়ি করবে—তা বেছে বেছে এসে করলে রাধানগরের এই শ্মশানে! সন্ধ্যেবেলা যখন ওদিকে চিতা জ্বলে আর হরিধ্বনি ওঠে—ভয়ে আমার বুক কাঁপে!

রাম ॥ শ্মশানের মতো পবিত্র জায়গা কি আর আছে? কত মানুষের কত চিতাভস্ম এখানে ছড়িয়ে আছে বলো তো? তোমাদের বিশ্বাস মতে এ তো দেবস্থান। শিব এখানে ছাই মেখে নেচে বেড়ান!

উমা ॥ শিব তো নাচেন, কিন্তু সাঙ্গপাঙ্গেরা—

রাম ॥ ভূত? ওইটেতেই আমার আপত্তি আছে। আত্মা হলেন নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত প্রবুদ্ধ। কুলোর মত কান আর মুলোর মতো দাঁত দেখিয়ে লোককে ভিমি খাওয়ানো তাঁর পেশা নয়। তাছাড়া (হাসলেন) ভূতটুত নেহাৎই যদি দেখতে পাও আমায় ডেকো। মন্তর জানি—এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব। সে যাক—এখন যাও, আমাকে কাজ করতে দাও।

উমা ॥ না, আর কাজ করতে হবে না! (খাতা কলম কেড়ে নিলেন) এখন খাবে, ওঠো!

রাম ॥ চিরকাল পুরুষের ধ্যানভঙ্গ করাটাই প্রকৃতির লীলা! আচ্ছা, তুমি যাও—আমি এখুনি উঠছি। শুধু একটা চিঠি লিখে যাই।

উমা ॥ চিঠি কোথায় লিখবে?

রাম ॥ কাশীতে। হরিহরানন্দ স্বামীর কাছে। জানো তো তাঁকে আমি গুরুর মতো মান্য করি। কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে একটু সংশয় হয়েছে। তাঁর মত নেব।

উমা ॥ ওই এক বিট্‌লে সন্ন্যাসী জুটিয়েছ বাপু! এদিকে অবধুত—ওদিকে হিন্দুধর্ম মানে না! যেমন শিষ্য, গুরুটিও তেমনি হওয়া চাই তো!

(যুবক গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন)

উমা ॥ আরে এ কে! ভাগ্‌নে যে!

গুরুদাস ॥ কেমন চমকে দিলাম তো! বছর খানেকের জন্যে মহলে ছিলাম। ফিরে তোমার খবর শুনে ছুটে এলাম। (এগিয়ে এসে রামমোহন ও উমাকে প্রণাম করলেন)

রাম ॥ জয়োহস্তু! কিন্তু হঠাৎ ছুটে এলে কেন গুরুদাস?

গুরুদাস ॥ রাধানগরে কেমন নতুন বাড়ি করেছ তাই দেখতে। তা জায়গাটি মন্দ নয় মেজ মামা। দিব্যি ফাঁকা! লোকজনের উপদ্রব নেই। (বসলেন)

উমা ॥ তা নেই। কিন্তু ভূতের উপদ্রব আছে।

গুরুদাস ॥ ভূত। সে কি?

রাম ॥ পেছনে সবটাই শ্মশান কিনা। তাই তোমার মেজ মামী ভয়ে তটস্থ। সে যাক। খবর ভালো তো?

উমা ॥ মুখুয্যে মশাই কেমন আছেন? আর দিদি?

গুরুদাস ॥ ভালোই আছেন সবাই। মা শুধু মাঝে মাঝে মেজমামার জন্যে কান্নাকাটি করেন—দেখতে চান। বাবারও এখানে খুব আসতে ইচ্ছে—কিন্তু সাহস পান না। সমাজের ভয় আছে তো!

রাম ॥ কিন্তু তুমি যে বড় এলে? তোমার সমাজের ভয় নেই গুরুদাস?

গুরুদাস ॥ না মামা! আমি জানি, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। টিকি আর একাদশীর মধ্যে শুধু ভণ্ডামি আছে—ধর্ম নেই!

উমা ॥ (হেসে উঠলেন) যাক, নিশ্চিন্ত। এবার আর ভয় নেই! এতদিনে একজন শিষ্য জুটল তোমার!

রাম ॥ তা জুটল। (হাসলেন) যদি দিন পাই, যদি কোনোদিন আমার নতুন ধর্ম প্রচারের সুযোগ আসে, তাহলে সেদিন গুরুদাসই হবে আমার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য। কিন্তু পরের কথা পরে। এখন যাও দেখি উমা—গুরুদাসের জন্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করো। আর ডাব পাড়াও গোটা দশেক।

গুরুদাস ॥ গোটা দশেক ডাব! কী হবে?

রাম ॥ কেন—খাবে?

গুরুদাস ॥ তাই বলে দশটা ডাব! আমি কি রাক্ষস?

রাম ॥ আরে ছিঃ ছিঃ বেরাদার! ছেলে-ছোকরার দল—দিনের পর দিন তোমরা হচ্ছ কী? দশটা ডাবের নামেই আঁৎকে উঠলে?

উমা ॥ তোমার মামার হালের খবর বুঝি রাখো না? যত বয়েস বাড়ছে, খাওয়াও বাড়ছে সেই সঙ্গে। আজকাল তো একেবারে এক কাঁদি ডাব নইলে চলে না। সের চারেক পাঁটা একাই জলযোগ করতে পারেন। পঞ্চাশটা ল্যাংড়া আম তো নস্যি!

(গুরুদাস খানিকটা হাঁ করে রইলেন; তারপর উঠে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন রামমোহনকে)

গুরুদাস ॥ এর পরে তোমাকে আরেকটা প্রণাম না করে উপায় নেই মেজ মামা।

(উমা হাসলেন—ভিতরে চলে গেলেন)

গুরুদাস ॥ আগে ভাবতাম, তুমি মহাপুরুষ। এখন দেখছি, সাক্ষাৎ অবতার।

রাম ॥ কী অবতার ? নৃসিংহ ?

(হেসে উঠলেন, গুরুদাসও হাসতে লাগলেন। কিন্তু আচমকা বাইরে থেকে একটা বিকট শব্দ ভেসে এলে)

নেপথ্যে ॥ (মুরগীর অনুকরণে) কঁর্—কোঁক্কোর—কোঁ !

গুরুদাস ॥ ওকি !

নেপথ্যে (একাধিক কণ্ঠে) কঁর্ কোঁ—। কঁক্-কঁক্-কোঁর—র্—র্—

(উমা ছুটে এলেন)

উমা ॥ ওগো, চুপচাপ বসে আছ কি ! সর্বনাশ হল যে !

গুরুদাস ॥ কী—কী হয়েছে মামীমা ?

উমা ॥ সেই রামজয় বটব্যাল আর গাঁয়ের লোকেরা। সেদিন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে শাসিয়ে গিয়েছিল। আজ বাড়ি ঘেরাও করেছে !

গুরুদাস ॥ ঘেরাও করেছে ! সাহস তো কম নয় !

নেপথ্যে ॥ (সমবেত ছড়ার সুরে)

হিঁদুর ছেলে মোছলমান—
মুর্গী এবং আণ্ডা খান—

(বিকট অট্টহাসি)

গুরুদাস ॥ আমি যাচ্ছি—

রাম ॥ থামো গুরুদাস ! (ভাগনের হাত চেপে ধরলেন) Let the dogs bark go, the Caravan will pass on—

নেপথ্যে ॥ কঁর্-র্—কোঁক্র—কোঁ—

গুরুদাস ॥ আর যে সহ্য হয় না মামা !

রাম ॥ ওরা পাগল বলে তুমিও ক্ষেপে যাবে ? চ্যাঁচাক্ না। আনন্দ করতে এসেছে—গলা ফাটিয়েই আনন্দ করে যাক।

(নেপথ্য থেকে একটা ঢিল উড়ে এল। পড়ল উমার কপালে)

উমা ॥ উঃ ! (বসে পড়লেন)

গুরুদাস ॥ রক্ত পড়ছে যে !

রাম ॥ ওকে ভেতরে নিয়ে যাও গুরুদাস। এখানে থাকলে আরো দু একটা লেগে যেতে পারে !

গুরুদাস ॥ চলো মামীমা—চলো—

(হাত ধরে উমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রামমোহন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখের পেশীগুলো কঠোর হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে সমানে শোনা যেতে লাগল :)

কঁকর—কঁকর কোঁ—
হিঁদুর ছেলে মুসলমান—
মুর্গী এবং আণ্ডা খান—

(দু একটা ঢিল এবং হাড় ছিটকে পড়তে লাগল মঞ্চের ওপর। একটা লাঠি নিয়ে গুরুদাস ফিরে এলেন—যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল, ছুটে যেতে চাইলেন সেদিকে—)

রামমোহন ॥ আঃ—কী হচ্ছে ! (টেনে ধরলেন গুরুদাসকে)

গুরুদাস ॥ ছেড়ে দাও মামা ! মামীমার মাথা ফাটিয়েছে, আজ ওদেরই একদিন কি আমারই একদিন ! এই লাঠিতে দশটার মুণ্ডু নামিয়ে ছাড়ব !

রাম ॥ পঞ্চাশজনের মহড়া আমিও নিতে পারি—সে শক্তি আমিও রাখি। কিন্তু গুরুদাস—এর প্রতিশোধ নেবার পন্থা তো ওটা নয় ! অজ্ঞতার সঙ্গে তামসিক লড়াইয়ে শুধু শক্তিই ক্ষয় হয়।

[নেপথ্যে : ব্যাটা বেদ-বেদান্ত কপ্‌চে মুখে
তলে তলে গোস্ত চালান—
কঁকর কোঁ—কঁকর কোঁ—

গুরুদাস ॥ (অধৈর্য) মামা !

রাম ॥ হাঁ—এ আক্রমণের জবাব আমি দেব। কিন্তু এদের ওপর

মিথ্যে রাগ করে কী হবে গুরুদাস? যে কুসংস্কারের প্রেত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওদের ঘাড়ে চেপে আছে—সেটাকেই আগে তাড়াতে হবে! গুরুদাস, আমি কলকাতায় যাব।

গুরুদাস ॥ কলকাতায়?

রাম ॥ হাঁ—সেই আমার কর্মক্ষেত্র! কলকাতায় গিয়ে এই মিথ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাব আমি। সেদিন তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ো—শক্তির পরিচয় দিয়ো সেইদিন। তার আগে আমার এদিককার সব ভার তোমায় দিয়ে গেলাম—তুমিই দেখা শোনা কোরো সব।

(নেপথ্যে : কোঁকোর কোঁ—)

(তন্ময়ভাবে) অন্ধকার! অন্ধকারে সারা দেশ মাথা ঠুকে মরছে! না—আর সময় নেই—নির্জন সাধনার সুযোগ নেই আর! গুরুদাস, কলকাতায় আমায় যেতেই হবে—যেতেই হবে—

—পর্দা পড়ল—

তৃতীয় অঙ্ক

[কলকাতায় রামমোহনের মানিকতলার বাড়ি। সময় : আনুমানিক ১৮১৬ সাল। বিলিতি কেতায় সাজানো একটি বসবার ঘর। রামমোহন—একা পায়চারী করতে করতে একখানা সংবাদপত্র পড়ছেন। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা]

রামমোহন ॥ আশ্চর্য কুসংস্কার! এত ভালো ইংরেজি শিখেছে—শাস্ত্রের ওপরেও প্রচুর দখল, তবু কী অসাধারণ অন্ধতা! (কাগজটা টেবিলে ফেলে দিলেন)

(দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীনাথ মুন্সী প্রবেশ করলেন)

আরে—আরে, কী সৌভাগ্য! একেবারে দিক্‌পালদের আবির্ভাব! জমিদার দ্বারকানাথ—মিস্টার ডেভিড হেয়ার—বসুন—বসুন সব—

(সকলে বসলেন)

রাধাপ্রসাদ—রাধাপ্রসাদ—

(রামমোহনের বড়ো ছেলে—কুড়ি বাইশ বছরের রাধাপ্রসাদ ঢুকলেন)

রাধাপ্রসাদ ॥ ডাকছেন বাবা?

রামমোহন ॥ দেখছ না—কারা সব এসেছেন? শিগ্‌গির খবর দাও ভেতরে। হরিকে বলো, এদের জন্যে জলখাবার নিয়ে আসুন।

(রাধাপ্রসাদ চলে গেলেন)

দ্বারকানাথ ॥ আঃ—এখন আবার এসব উৎপাত বাড়াচ্ছেন কেন?

রামমোহন ॥ দ্যাখো দ্বারকানাথ, তোমার সব ভালো—কেবল এইটেই দোষ। আরে, দিনরাত যে মানুষ এত খেটে মরে—সে তো পেটের জন্যেই! প্রাণ খুলে খেতে না পারলে বেঁচে সুখ আছে

নাকি ? বুঝলে বেরাদার—দিনে অন্তত বারো সের দুধ না হলে আমার চলে না।

ডেভিড্ হেয়ার ॥ (হেসে উঠলেন) রায় মহাশয় সত্যই সুপারম্যান!

রাম ॥ কথাটার মধ্যে তোমার মৌলিকত্ব নেই—ওটা অনেক আগেই আমার ভাগ্নে ঘোষণা করেছিল। তারপর হেয়ার—আজকাল মাগুর মাছ খাচ্ছ কেমন ?

অন্নদা ॥ হঠাৎ মাগুর মাছ! ব্যাপার কী ?

হেয়ার ॥ আপনি জানেন না অন্নদাবাবু ? রায় মহাশয় একদিন আমাকে ইনভাইট্ করিয়া মাগুর মৎস্যের ঝোল খাওয়াইল। সেই হইতে লোভ লাগিয়া গেল। আজকাল প্রায়ই কিনিয়া খাইতেছি—ওঃ লাভলি!

কালী ॥ তবু তো হেয়ার সাহেব গঙ্গার ইলিশ খাননি—খেলে দিনরাত গঙ্গার ধারেই বসে থাকতেন—আর উঠে আসতেন না।

(হেয়ার হা হা করে হেসে উঠলেন)

হেয়ার ॥ তা যা বলিয়াছেন। বাংলা দেশকে এতদিন সাইকলজিক্যালি ভালোবাসিয়াছি—এবার মনে হইতেছে, ফিজিওলজিক্যালি-ও তাহার প্রেমে পড়িব।

দ্বারকা ॥ (টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলেন) এটা আবার কী ? 'ম্যাড্রাস কুরিয়র' দেখছি।

রামমোহন ॥ হাঁ—ওতে মাদ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রীর একটা লেখা বেরিয়েছে। আমার 'বেদান্ত ভাষ্য'কে তুলোধুনো করে দিয়েছে একেবারে। তাছাড়া ক্যালকাটা গেজেটে আমাকে যে প্রশংসা করেছিল তাও বরদাস্ত করতে পারেনি। প্রমাণ করে ছেড়েছে, আমি একটি মূর্তিমান নির্বোধ!

দ্বারকা ॥ আপনি চুপ করে যাবেন নাকি ?

রামমোহন॥ আমাকে তো জানোই। একটি সাক্ষাৎ লড়ায়ে মুর্গী। ঝগড়ার গন্ধ পেলে মন একেবারে উৎসাহে আকুল হয়ে ওঠে! শাস্ত্রীজী এখনো জানেন না—কোথায় খোঁচা দিচ্ছেন! এমন জবাব দেব যে দেব্‌তাটি একেবারে পাকাপাকি মৌন-অবলম্বন করবেন।

অন্নদা॥ আপনার ঐ তর্কের জন্যেই লোকে এমন করে চটে যায়।

কালী॥ সেদিন প্রকাশ্য সভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে অমন করে জব্দ করলেন—ওদের দলবল এখন আপনার নামে যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছে!

হেয়ার॥ ভেরি স্যাড্‌!

রামমোহন॥ সব চাইতে আশ্চর্য কী, জানো হেয়ার? তর্ক হল বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ন্যায়-শাস্ত্রের চরম উন্নতি বাঙালিরই হাতে। এই বাংলাই নৈয়ায়িক গৌতমের দেশ। অথচ আজ এমন অধোগতি হয়েছে যে বিচারে হেরে গেলে রাগে-হিংসেয় খুন করে বসতে চায়।

দ্বারকানাথ॥ অধঃপতনটা সব দিক থেকেই হয়েছে বলে ন্যায়-তর্কও জাত হারিয়েছে।

হেয়ার॥ ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া আমার অত্যন্ত বেদনা জাগে, রায় সাহেব! এত বড় দেশ—এত বড় জাতি—আজ তারা কোথায় নামিয়া দাঁড়াইয়াছে!

রামমোহন॥ বিদেশী হয়েও আমাদের জন্যে তুমি যা করছ হেয়ার, তার ঋণ দেশ কখনো শুধতে পারবে না। তোমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি, আজ ব্রিটেন এত বড় হয়েছে কী করে।

হেয়ার॥ (লজ্জিত) ছিঃ ছিঃ—এসব বলিয়া আমাকে লজ্জা দেওয়া কেন? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র—সামান্য একজন ঘড়ির ব্যবসাদার মাত্র।

অন্নদা॥ (সকৌতুকে) কিন্তু হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসায় এবার ফেল

পড়বে। এ দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে লালবাতি জ্বলবে ওরে দোকানে।

দ্বারকা॥ (.ম্যাড্রাস কুরিয়ারখানা পড়ছিলেন, নামিয়ে রাখলেন) তাছাড়া হেয়ারের অবস্থাও দাঁড়িয়েছে চমৎকার। না ঘরকা, না ঘাটকা! ওর স্বজাতিরা ওকে নেটিব্ ঘেঁষা নাস্তিক বলে উড়িয়ে দেয়, আবার দেশী লোকের ঘরে উঠলে তারা কলসীর জল ফেলে!

হেয়ার॥ (হেসে উঠলেন) ভালোই তো আমি মাঝখানে থাকিব। ইওরোপ আর ভারতের মাঝখানে সেতু রচনা করিব।

রামমোহন॥ বেরাদার, কথাটা ঠাট্টা করে বললে বটে, কিন্তু নিজেই জানো না আজ কত বড় একটা সত্য তুমি উচ্চারণ করলে। আমি তোমায় বলছি, দিন আসবে। কাল হোক, পরশু হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হোক। তোমার দেশ সেদিন তোমায় চিনবে কিনা জানি না, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ তোমার নামে মাথা নোয়াবে!

হেয়ার॥ (বিব্রত) ওসব এখন থাকুক। যে ব্যাপারের জন্য আমরা আসিয়াছি। বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জির চেষ্টায় কাজ হইয়াছে। কাল সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ইস্টের সঙ্গে দেখা হইল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনিও খুবই আগ্রহী। শীঘ্রই শহরের সমস্ত বিশিষ্ট লোককে লইয়া তাঁহার গৃহে একটা মিটিঙের ব্যবস্থা করিতেছেন। তোমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া খুব খুশি হইয়াছেন তাহাও বলিলেন।

দ্বারকা॥ মহারাজ কালীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত দেবের দলবল আবার বাগড়া না দেয়। ওঁরা তো সংস্কৃতওলাদের চাঁই! ইংরেজি শিখলে নাকি জাত যাবে!

অন্নদা॥ রাধাকান্ত দেব কিন্তু একটু শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন মনে হয়।

বিহারী চেবের বাড়িতে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিধ্বস্ত করবার পরে রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের খুব প্রশংসা করে বেড়াচ্ছেন।

কালী॥ ও মুখেই—কাজে বিরোধিতা তো সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা নয়—আসলে হয়তো সায়েবদের খুশি করতে চান।

দ্বারকা॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা সবাই মত দিচ্ছেন শুনলাম। এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

অন্নদা॥ হবেন না? চাকরীর মায়া আছে তো!

রামমোহন॥ এটা অপবাদ হচ্ছে অন্নদা। আর সকলের সম্পর্কে যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় খাঁটি মানুষ। হোন রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁর চরিত্রে যেমন ফাঁক নেই, তেমনি বিদ্যাতেও নয়। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সঙ্গে আমার মত না মিলতে পারে, কিন্তু 'রাজাবলি'র মতো বইয়ের যিনি স্রষ্টা, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

দ্বারকা॥ (মাথা নাড়লেন) ঠিক।

রামমোহন॥ বৈদ্যনাথবাবু কাজের মতো কাজ করেছেন একটা। হাওয়া যেন একটু অনুকূলে বইছে—আশা পাচ্ছি। ভালো কথা হেয়ার, তোমার কি এর মধ্যে অ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হেয়ার। হাঁ, কাল আমার দোকানে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই শত মুখে তোমার প্রশংসা! অমন গোঁড়া পাদ্রী অ্যাডাম—তিনি যেভাবে তোমার প্রেজ্ করিলেন, আমার খুব আশ্চর্য লাগিল। হয়তো বা একদিন তোমার ডিসাইপল হইয়াই বসিবেন-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[একজন বেয়ারা প্রবেশ করল। সেলাম করে রামমোহনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, একখানা চিঠি দিলে, আবার সেলাম করে বিদায় নিলে

থাম খুলে চিঠি পড়লেন রামমোহন। প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে তার মুখ]

দ্বারকা ॥ কার চিঠি দাদা ?

রামমোহন ॥ নিমন্ত্রণপত্র। তোমরাও পাবে।

কালী ॥ কি রকম ?

রামমোহন ॥ বৈদ্যনাথবাবু লিখছেন। কাল বিকেলে ঈস্ট্ সাহেবের কুঠিতে একটা সভা বসছে। শহরের গণ্যমান্য সবাই আসছেন— এ দেশের ছেলেদের জন্যে ইংরেজি কলেজ করবার একটা প্ল্যান চক্-আউট করা হবে।

অন্নদা ॥ খুব ভালো খবর।

রামমোহন ॥ আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে দ্বারকা। কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছি আমি! দেশের বুক থেকে মোহের জাল কেটে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে কুসংস্কারের রাত্রি! পৃথিবীর দশ দিক থেকে আসছে জ্ঞানের আলোকবন্যা। লোকাচারের নাগপাশ ছিঁড়ে জেগে উঠছে একটা সুস্থ সবল নতুন জাতি। এ বুঝি তারই সূচনা!

হেয়ার ॥ হাঁ, ইহা তাহারি সূচনা। তুমি ঠিকই বলিয়াছ রায়!

(রাধাপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন)

রাধাপ্রসাদ ॥ ভেতরে খাবার দেওয়া হয়েছে বাবা। আপনারা চলুন।

দ্বারকা ॥ ডোবালে দেখছি! এই অসময়ে আবার খাওয়া ?

রাধা ॥ বেশি কিছু নয় কাকা সামান্য জলযোগ।

দ্বারকা ॥ সামান্য তোমার বাবার পক্ষে, আমাদের পক্ষে প্রাণান্তকর।

(রাধাপ্রসাদ হেসে ফেললেন)

রামমোহন ॥ দ্যাখো দ্বারকানাথ, তোমার ওসব জমিদারী বুলি ছাড়ো। যতই যা করো, বামুনের ছেলে তো বটে! অগস্ত্যের ট্র্যাডিশন ভুলে যাচ্ছ কেন ? খাওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তত চক্ষুলজ্জা করা উচিত নয় বেরাদার। চলো হেয়ার। ওঠো হে কালীনাথ, অন্নদা—

হেয়ার ॥ হাঁ, হাঁ, হট্ মীল ডাকিতেছে, দেরী করিলেই ঠকিতে হইবে।

কালীনাথ ॥ হেয়ারের জন্যে মাগুর মাছের ঝোল আছে তো রাধু?

(সকলে হাসলেন)

রাধাপ্রসাদ ॥ (হেসে) না।

হেয়ার ॥ না থাকিলে অন্য কমপেন্‌সেশন্ আছে, সে আমি জানি। চলো, চলো—

রামমোহন ॥ রাধাপ্রসাদ, ওঁদের নিয়ে যাও, আমি আসছি—

(সকলে রাধাপ্রসাদকে অনুসরণ করে চলে গেলেন। রামমোহন কিছু কাগজপত্র গোছানো শেষ করলেন, তারপর বেরোতে যাবেন, এমন সময়ঃ

বছর ষোলো-সতেরোর নন্দকিশোর বসু এবং তাঁর বালিকা স্ত্রী প্রবেশ করলেন। নন্দকিশোরের স্ত্রী কাঁদছেন।

রামমোহন চমকে উঠলেন)

রামমোহন ॥ খবর কিহে নন্দকিশোর? এটি কে?

নন্দকিশোর ॥ (বিবর্ণ মুখে) আমার—আমার স্ত্রী।

রামমোহন ॥ (মৃদু ভর্ৎসনাভরা গলায়) এরই মধ্যে বিয়ে করে বসেছ তা হলে! আঃ—এই বাল্যবিবাহের পাপ দেশ থেকে কবে যে যাবে! তা হয়েছে কী? কাঁদছে কেন মেয়েটি?

(মেয়েটি রামমোহনের পায়ের কাছে বসে পড়ল, কাঁদতে লাগল)

মেয়েটি ॥ আমায় ওরা তাড়িয়ে দেবে বাবা। আমার মুখ দেখবে না!

রামমোহম ॥ বটে—বটে! ব্যাপার কিহে নন্দকিশোর? অনর্থক এই কচি মেয়েটার ওপর এরকম বীরত্ব কেন?

নন্দকিশোর ॥ (বার কয়েক খাবি খেলেন) আপনাকে বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু ভারী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে একটা।

মেয়েটি ॥ (কেঁদে চলল) কিন্তু আমার কী দোষ? কী করেছি আমি? কেন ওরা আমায় তাড়িয়ে দেবে?

রামমোহন ॥ (আশ্বাস দিয়ে) কেউ তোমায় তাড়াতে পারবে না মা—তোমার কোনো ভয় নেই। নন্দ, লজ্জা করলে চলবে না। খুলে বলো সব।

নন্দকিশোর ॥ কথাটা হল—ইয়ে—বাবা বেজায় চটে গেছেন। বিয়ের আগে ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে শেষে কালো—

রামমোহন ॥ বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু কে দায়ী এই ছলনার জন্যে? এই মিথ্যে কার সৃষ্টি? নন্দকিশোর, নিজেদের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে আর একজনকে অপরাধী কোরো না।

নন্দকিশোর ॥ (মাথা নিচু করে রইলেন) তবু কালো মেয়ে—

রামমোহন ॥ কালো মেয়ে! (উত্তেজিত হয়ে উঠলেন) কালো মেয়ে বলেই তার দাম কানাকড়ি! শোনো নন্দকিশোর। স্ত্রীর পরিচয় মাত্র একটা ফর্সা চামড়ায় নয়—সে পরিচয় জীবনের মধ্যে। আমার কথা শোনো—মাথায় করে নিয়ে যাও ওকে। হয়তো দেখবে এই স্ত্রীই এমন সন্তানের জননী হবে—যার মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম থাকবে উজ্জ্বল হয়ে।*

মেয়েটি ॥ বাবা

রামমোহন ॥ (মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, সস্নেহে) সব ঠিক হয়ে যাবে মা, ঘরে যাও। কিছু হলে আমি দেখব। যাও নন্দ, মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাও—

(মেয়েটি তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করল)

কল্যাণী হও মা, স্বামীর জীবনের জয়লক্ষ্মী হও। নিয়ে যাও নন্দ—

(নন্দ স্ত্রীকে নিয়ে বিদায় নিলেন। রামমোহন তাকিয়ে রইলেন)

* রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। এই কালো মেয়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু।

কালো মেয়ে—তাই তার দাম নেই। সমাজ! আশ্চর্য!

(ভেতর থেকে হেয়ারের কণ্ঠ ভেসে এল)

হেয়ার॥ কই রায় মহাশয়, আমাদের খাওয়াইতে বসিয়া হোস্ট-এরই সাক্ষাৎ নাই!

রামমোহন॥ (হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলেন) হাঁ—হাঁ—আমি আসছি—

—দুই—

[সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের কুঠি।

এই কুঠির একটি হলঘর। দুধারে সার-দেওয়া চেয়ার আর এই দুটি সারির পেছনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে মুখ করে একখানা বড় টেবিল ও উঁচু চেয়ার। দুধারের চেয়ারগুলিতে কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি আসীন। তাঁদের মধ্যে রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতিকে চিনতে পারা যাচ্ছে।

স্যার এডওয়ার্ড ও তাঁর পেছনে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে ঢুকলেন। সকলে দাঁড়ালেন। বৈদ্যনাথের হাতে কিছু কাগজপত্র।]

বৈদ্যনাথ ॥ লেট মি ইনট্রোডিউস, লর্ডশিপ! রাধাকান্ত দেব—

[তরুণ রাধাকান্তের সঙ্গে ঈস্ট করমর্দন করলেন]

মতিলাল শীল—

[কৃষ্ণবর্ণ, কুরূপ মতিলালের সঙ্গে করমর্দন]

তারাচাঁদ দত্ত—ভৈরবধর মল্লিক—জয়কৃষ্ণ সিংহ—মহারাজ কালীকৃষ্ণ, পণ্ডিত (হ্যাণ্ডশেকের পর নমস্কারও করলেন একটা) পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—দ্বারকানাথ ঠাকুর—রামমোহন রায়—ডেভিড্ হেয়ার—

[করমর্দন শেষ করে ঈস্ট বড় চেয়ারখানায় আসন নিলেন। তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন]

ঈস্ট্ ॥ তাহা হইলে—উইথ ইওর পারমিশন—আমরা কার্য আরম্ভ করতে পারি?

বৈদ্যনাথ ॥ আরো দু-চারজন যদি আসেন—

রাধাকান্ত ॥ মোটামুটি সবাই এসেছেন ॥ আর অপেক্ষা করা যায় না। (নিজের সোনার ঘড়ি দেখলেন) চারটেও বেজে গেছে।

তারাচাঁদ ॥ হাঁ, দেরি করে লাভ নেই। বলুন বৈদ্যনাথবাবু।

(বৈদ্যনাথ ঈস্টের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন)

বৈদ্যনাথ ॥ আজকের এটা অবশ্য ফর্‌মাল মিটিং নয়। এখানে আমরা ঘরোয়া ভাবেই জিনিসটা নিজে আলোচনা করব। নিজেদের ভেতরে একটা সেট্‌ল্‌ করে নিয়ে পরে আমরা কোম্পানিকে মুভ করতে পারি।

রামমোহন ॥ বেশ, বলুন সেটা।

ঈস্ট্‌ ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। এ দেশীয় বালকদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সকল দিকেই বাঞ্ছনীয়। দেশীয় লোকেরা এতদিন ওয়েস্টার্ণ এডুকেশন-এ বাধা দিয়াছেন বলিয়াই এ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। রিসেন্ট্‌লিংএ আপনারা অনেকেই উৎসাহিত হইয়াছেন বলিয়া আমি এই মিটিং কল করিতে সাহসী হইয়াছি। এ জন্যে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইব ঢাকা কালেক্‌টরীর ট্রেজারার বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে। তাঁহার চেষ্টাতেই এই আয়োজন।

বৈদ্যনাথ ॥ আমি কিছুই করতে পারতাম না—যদি রামমোহন রায় আর হেয়ার সাহেব আমাকে সবরকমে উৎসাহ আর উপদেশ না দিতেন।

ঈস্ট্‌ ॥ হাঁ, রায়ের সঙ্গে I had very long discussions. He is the brightest man in this country—I think!

(রাধাকান্ত, জয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। তারাচাঁদের ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল)

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তাতে আর সন্দেহ কি। ওঁর মতো বিচক্ষণ লোক এখন এ দেশে দুর্লভ।

তারাচাঁদ ॥ (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে—বিরক্তভাবে) রামমোহনের প্রশস্তি বন্ধ করে সভার কাজটা চালিয়ে গেলেই কি ভালো হয় না।

(ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। সব চাইতে বেশি অপ্রতিভ হলেন ঈস্ট)

ঈস্ট্॥ Why—of course! But every one must get—(একটু চুপ করে) Any way, এখন কিভাবে আমরা proceed করিব?

রাধাকান্ত॥ প্রথমে প্রতিষ্ঠানের একটা নাম—

বৈদ্যনাথ॥ Provisionally মহাবিদ্যালয় ঠিক করা হয়েছে।

ঈস্ট্॥ (হেসে) যাহাতে আপনারা misunderstand না করেন। Western Education মানেই যে Christianity preach করা নয়—সেটা আমরা clear রাখিতে চাই। আপনাদের মহাবিদ্যালয়ে ভারতীয় শিক্ষাই দেওয়া হইবে।

রাধাকান্ত॥ (শুকনো গলায়) Thank you!

বৈদ্যনাথ॥ প্রথম হল finance-এর প্রশ্ন। কলেজ শুরু করতে যে টাকাটা গোড়াতেই দরকার হবে, তার কী ব্যবস্থা করা যাবে?

রামমোহন॥ কোম্পানির কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ যে টাকাটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সেটা কী হল?

ঈস্ট্॥ You see Mr. Roy' টাকাটা কিভাবে যে দেওয়া হইবে—the process is not yet clearly defined. So it may take months, if not years!

রামমোমন॥ তা হলে ও জন্যে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

বৈদ্যনাথ॥ সেই জন্যেই আজ আরো বিশেষ করে সকলকে ডাকা। কার কাছে থেকে কী সাহায্য পাওয়া যাবে—

ভৈরবধর॥ টাকার ব্যবস্থা আমরা করতে রাজী আছি—যদি তার সদ্ব্যয় হয়।

দ্বারকানাথ॥ আমাদেরই ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, টাকার অপব্যয় হবে কেন? তা ছাড়া চীপ জাষ্টিস নিজেও তো রয়েছেন মাথার ওপর।

ভৈরব ॥ চীপ জাষ্টিস তো আর নিজে সব দেখবেন না। কারা কল-কাঠি নাড়বেন, সেটাও বোঝা দরকার। (বাঁকা চোখে তাকালেন)

রাধাকান্ত ॥ থামুন মল্লিক মশাই। তা আপনি কি donation-এর কথা বলছেন বৈদ্যনাথ বাবু?

ঈস্ট্ ॥ Yes—yes donations. (হাসলেন) Generous donations from leading citizens like you!

কালীকৃষ্ণ ॥ একটা হিসেব করুন না তা হলে। কত লাগবে দেখি।

বৈদ্যনাথ ॥ হিসেব আমি করেই রেখেছি রাজা বাহাদুর। (কাগজপত্র উল্টে) আপাততে—এই লাখখানেক টাকার মতো হলেই শুরু করে দেওয়া যাবে। তারপর চাপ দেওয়া যাবে কোম্পানিকে।

রামমোহন ॥ সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কোম্পানির টাকা আদায় করা যাবেই।

রাধাকান্ত ॥ (ঘড়ি দেখে—অধৈর্যভাবে) সময় নষ্ট করে কী হবে বৈদ্যনাথ বাবু? কোম্পানির টাকা আদায়ের দায়িত্ব নেবার লোকের অভাব হবে না। (একবার তির্যক কটাক্ষে রামমোহনের দিকে তাকিয়ে নিলেন) নিন—চাঁদা ধরুন।

ঈস্ট্ ॥ চাঁদা ধরিবার কিছু নাই। এ তো আর জোর করিয়া লওয়া যাইবে না। যাঁহার যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেইভাবেই দিবেন। এবং যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক লইয়াই অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইবে।

রাধাকান্ত ॥ আমি দশ হাজার টাকা দেব।

ঈস্ট্ ॥ (হাসলেন) Thank you very much.

(বৈদ্যনাথ একটা কাগজে লিখে নিতে লাগলেন)

বৈদ্যনাথ ॥ মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর?

কালীকৃষ্ণ ॥ লিখুন দশ হাজার—

বৈদ্যনাথ ॥ বাবু মতিলাল শীল ?

মতিলাল ॥ পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ ॥ বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ ?

জয়কৃষ্ণ ॥ পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ ॥ বাবু রামমোহন রায় ?

তারাচাঁদ ॥ (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন) আমি আপত্তি করছি। রামমোহন রায়ের কাছ থেকে কোনো চাঁদা নেওয়া চলতে পারে না।

দ্বারকানাথ ॥ } তার অর্থ

হেয়ার ॥ } What do you mean ?

[কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন উঠলেন ; একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছেন।]

কাশীনাথ ॥ মাননীয় বিচাপতি বাহাদুর, অস্মদ্‌দিগের বক্তব্য এই যে পরম অধর্মাচারী ম্লেচ্ছ বাবু রামমোহন রায় এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হইলে সনাতধর্মসেবী নৈষ্ঠিক আর্যসন্তানগণ ইহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইবেক।

ঈস্ট্ ॥ (হতবাক্) Strange !

হেয়ার ॥ (চেঁচিয়ে উঠলেন) Highly objectionable !

দ্বারকা ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) অত্যন্ত অন্যায় ! অত্যন্ত আপত্তিকর !

রামমোহন ॥ আঃ—কী হচ্ছে হেয়ার। দ্বারকা স্থির হয়ে বোসো। ওঁরা কী বলছেন, বলতে দাও।

বৈদ্যনাথ ॥ (হতভম্বের মতো) এক্ষেত্রে এ-রকম আপত্তির কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (মাথা নেড়ে) নিশ্চয় না ; তর্কপঞ্চানন মহাশয়, শাস্ত্র নিয়ে আমাদের পুরোনো তর্কের স্থান এটা নয়। বাবু রামমোহনের সঙ্গে

আমারও প্রচুর মতভেদ আছে। কিন্তু এ তো শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে এসব অনাবশ্যক কথা তোলা কেন ?

কালীকৃষ্ণ॥ পুরোনো তর্ক নয়। অনাবশ্যক কথাও নয় বিদ্যালঙ্কার মশাই। আপনি নিজেই জানেন, রামমোহন রায় এই দু বছর ধরে সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁর বেদান্ত, বেদান্তসার, উপনিষদের ব্যাখ্যা—হিন্দুর চরম অপমান। ব্যক্তিগত ভাবেও তিনি যা ইচ্ছে করেন, হিন্দুত্বের কোনো কিছুই মানেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যে আমদের সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ভ্রষ্টাচারী। তিনি যদি এই প্রতিষ্ঠানে থাকেন, তাহলে আমদের সরে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই।

হেয়ার॥ This is senseless Raja Sahib !

রামমোহন॥ আঃ, থামো না হেয়ার! ওঁরা তো অন্যায় কিছু বলছেন না। হিন্দুধর্ম বলতে ওরা যা বোঝেন, তা তো আমি সত্যিই মানি না। তোমাকেও কোনো মিশনারী ধার্মিক বলে স্বীকার করবে না হেয়ার।

দ্বারকানাথ॥ তাই বলে—

মতিলাল॥ হাঁ, সেই জন্যেই উনি থাকলে আমাদের আপত্তি আছে।

ঈস্ট্॥ I do not know what Rammohan's religion is। কিন্তু আমি একজন Christian—rather a very sincere Christian—আমি যদি সাধ্যমতো আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে চাই, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন না ?

তারাচাঁদ॥ না, না, কক্ষনো না।

ঈস্ট্॥ Why ?

রাধাকান্ত॥ আপনি টাকা দিলে আমরা আন্তরিক খুশিই হবো। কারণ, আপনি ক্রীশ্চান হলেও ধার্মিক। ধার্মিকের সঙ্গে আমাদের

বিরোধ নয়—বিরোধ নাস্তিকের সঙ্গে। আমরা মনে করি, রামমোহন রায় নাস্তিক।

কালীকৃষ্ণ॥ ঠিক কথা। এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ভৈরব॥ এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত।

কাশীনাথ॥ অস্মদ্‌দিগের আর্য-শাস্ত্রেরও এবম্‌ প্রকার নির্দেশ আছে।

দ্বারকানাথ॥ (উত্তেজিত) বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে আমরাও সবাই সরে দাঁড়াচ্ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে এমন সংকীর্ণতা সেখানে আমরাও কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

কালীনাথ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

রামমোহন॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) বোসো দ্বারকানাথ। হেয়ার থামো। এমন মারাত্মক ভুল কেন করছ? কেন আমার জন্যে দেশের ক্ষতি করবে—কেন জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দেবে? তা হতে পারে না। আমার অর্গানাইজিং কমিটিতে থাকাটাই কি বড় কথা হল? কী আমি? কতটুকু আমার সামর্থ্য? আমি সরে গেলে যদি সবাই দ্বিধাহীন হয়ে শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী আছে? সেই আনন্দের অংশ নিয়েই এ সভা থেকে আমি বিদায় নিলাম (ঈস্টকে) Sir, if you kindly permit me to leave—

(ঈষ্ট নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন, রামমোহন বেরিয়ে গেলেন।)

মৃত্যুঞ্জয়॥ ছিঃ—ছিঃ ভারী অন্যায় হল, ভারী বিশ্রী হ'ল।

ঈস্ট্॥ (আত্মগত ভাবে) A man, but what a man!

—তিন—

[আরো কয়েক বছর পরের কথা।
রামমোহনের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষ। ঘরখানি ইওরোপীয় রুচি অনুসারে প্রায় আধুনিক ভাবে সাজানো। বৃদ্ধা তারিণী মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসনে বসে মালা জপ করছেন। মধ্যবয়সী উমা একটু দূরে মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন।]

উমা॥ আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি মা, একটু জলটল কিছু মুখে দিন এবার।

তারিণী॥ কেন মিথ্যে অনুরোধ করছ মেজ বৌ! বলেছি তো, আমি কিছু খাব না।

উমা॥ আজ বারো বছর পরে ছেলের বাড়িতে আপনি পা দিলেন। এত দিনেও কি আপনার রাগ পড়েনি মা? আজো কি আপনি ক্ষমা করতে পারেন নি?

তারিণী॥ ক্ষমা! জেনে শুনেও কেন একথা জিজ্ঞেস করছ বউমা! ক্ষমা করবার আমি কে! সে তো আমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি। তার অপরাধ ধর্মের কাছে। ধর্ম যদি তাকে ক্ষমা না করে—আমি কী করে করব?

উমা॥ (কাতর কণ্ঠে) আপনার কি পাষাণের প্রাণ মা? নিজের সন্তান—

তারিণী॥ শুধু সন্তান নয় মেজ বৌ। আর সকলকে নারায়ণ টেনে নিয়েছেন, শিবরাত্রির সলতে বলতে ওই একা! তুমিও তো মা! বোঝো না, সন্তানের জন্যে মায়ের বুক কেমন করে? কেমন করে ভুলব—দশ মাস ওকে আমি পেটে ধরেছি—কেমন করে ভুলব বৌমা ও আমার কত দুঃখের ধন?

উমা॥ তবু কেন এমন করে কঠোর হচ্ছেন মা? আপনি তো জানেন না, আপনার আশীর্বাদের উনি কতবড় কাঙাল? আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম না করে উনি কোনোদিন জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না!

তারিণী ॥ জানি—সব জানি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। সমাজ, ধর্ম, সংসারের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে। সে যেই হোক, কেমন করে তাকে স্বীকার করব? সন্তানের চেয়ে ধর্ম বড়, তারও চেয়ে বড় আমার স্বামীর আদেশ।

উমা ॥ মা!

তারিণী ॥ না, দোষ ওরও নয়। এ হতই—কেউ আটকাতে পারত না। বাবার অভিশাপ। বাবার অভিশাপ তো মিথ্যে হতে পারে না।

উমা ॥ (সবিস্ময়ে) কিসের অভিশাপ মা?

তারিণী ॥ ওর দু'বছর বয়েসের সময় ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। একদিন দেখি—দরদালানে বাবা পুজো করছেন আর মোহন তাঁর পাশে বসে পুজোর বেলপাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। যেমন ভয় হল, তেমনি রাগ হল! একি অনাচার! অসাবধান বলে বাবাকে যা নয় তাই গালাগালি করলাম। আগুনের মতো মানুষ আমার বাবা—সইতে পারলেন না। অভিশাপ দিয়ে বললেন, যে সন্তানের জন্যে মেয়ে হয়ে আমি তাঁকে অপমান করেছি—সে সন্তান বড় হয়ে ম্লেচ্ছ হবে!

(উমা বিহ্বল হয়ে রইলেন)

জানতাম—আমি জানতাম! বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য—তাঁর কথা মিথ্যে হবে না! না, ওর দোষ নয়। এ আমারি পাপ—আমারি অপরাধ! বড় হয়ে যেদিন মোহন এ অভিশাপের কথা ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—সেদিন—সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম! বুঝেছিলাম পিতৃশাপ ফলতে শুরু করেছে। আমার শাস্তি আমি পাচ্ছি—মোহন শুধু নিমিত্ত মাত্র!

(নেপথ্যে রামমোহন—উমা উমা। রামমোহন প্রবেশ করলেন। উমা ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ালেন)

উমা ॥ এখুনি এলেন?

রাম ॥ এ কী! মা! মা!

(ছুটে প্রণাম করতে গেলেন। তারিণী পা সরিয়ে নিলেন)

তারিণী ॥ থাক বাবা। তোমার ও কাপড়ে আমায় ছুঁয়ো না।

(রামমোহন স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ)

রামমোহন ॥ বুঝেছি। আমার প্রণাম তুমি নেবে না।

(তারিণী কোনো জবাব দিলেন না)

নাই নিলে, কিন্তু আমার মনের প্রণাম তো তুমি ঠেকাতে পারবে না! আজ বারো বছর তোমায় দেখিনি! এর মধ্যে কত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি। মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। তোমায় যে চিনতেই পারা যায় না!

তারিণী ॥ বয়স বাড়লেই লোকে বুড়ো হয় বাবা—চুলও পাকে। তুমিও অনেক বদলে গেছ। শুনেছি দেশজোড়া নাম হয়েছে তোমার। মিত্র যত বেড়েছে—শত্রু বেড়েছে তার হাজারগুণ।

রামমোহন ॥ সত্যের জন্যে যে দাঁড়ায়—শত্রু তার বেশিই থাকে মা।

তারিণী ॥ সত্য! তোমার কাছে যা সত্য—অন্যের কাছে তা সর্বনাশ। আমিও তাদেরই দলে। তুমি তো জানো মোহন, আমিও তোমার শত্রু। জগমোহনের বড় ছেলে গোবিন্দকে দিয়ে তাই তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলাম—সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম—

রামমোহন ॥ কিন্তু কোনো দরকার ছিল না মা! তুমি আদেশ করলে ও আমি এমনিই গোবিন্দকে ধরে দিতাম। আর যে সম্পত্তি তোমরা আমায় দিতে চাওনি—আমি তো তা দাবীও করিনি। তার প্রায় সবই আমি গুরুদাসকে দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের শক্তি আছে—সামান্য শিক্ষাও আছে—নিজের জীবিকা উপার্জন করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ও সব কথা থাক মা। (মৃদু হাসলেন) কিন্তু আমি জানি—বাইরে তুমি আমার যত শত্রুতার ভানই করো—মনে মনে রোজই আমায় আশীর্বাদ করে চলেছ।

তারিণী। না। মনে মনেও তোমায় আমি আশীর্বাদ করিনি মোহন! প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিয়েছি—সর্বনাশ কামনা করেছি!

রামমোহন॥ মায়ের অভিশাপ সন্তানকে লাগে না মা। আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

তারিণী॥ জানি না। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কাছে কেন এসেছি—সে কথা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না!

রামমোহন॥ আমাকে দেখতে এসেছ—এর আর কী জিজ্ঞাসা করব মা?

তারিণী॥ না—নিঃস্বার্থ ভাবে দেখতে আসিনি। সে প্রাণের টান তোমার ওপর আমার থাকতে নেই। আজ তোমার কাছে আমি ভিক্ষের জন্যে হাত পেতেছি বাবা!

রামমোহন॥ ভিক্ষে! সে কি মা?

তারিণী॥ হাঁ—কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছি।

রামমোহন॥ সাহায্য! আমার কাছে সাহায্য চাও তুমি? হুকুম করো মা! কত টাকা তোমার চাই? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? আরো বেশি?

তারিণী॥ তোমার ওপর হুকুম করার জোর আমি রাখিনি বাবা। সে দাবি নয়। শুধু বড়লোকের কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। বেশি নয়—মাত্র পাঁচ শ টাকা!

রামমোহন॥ মাত্র পাঁচ শ টাকা!

তারিণী॥ হাঁ বাবা। সম্পত্তির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। সব ডুবে গেছে বললেই হয়। রাজরাজেশ্বরের নিত্য সেবা পর্যন্ত হচ্ছে না! সেই সেবার জন্যেই—

রামমোহন॥ মা!

তারিণী॥ হাঁ বাবা। রাজরাজেশ্বর রাধারাণীর সেবার জন্যেই এ টাকা চাইতে এসেছি তোমার কাছে।

রামমোহন ॥ (একটু চুপ করে থেকে) তোমায় আমি দশ হাজার টাকা এই মুহূর্তেই দিচ্ছি মা। কিন্তু পাথরের বিগ্রহ পূজোর জন্যে নয়! এই টাকা নিয়ে গিয়ে তুমি দরিদ্র-নারায়ণ সেবা করাও—সেই হবে দেবতার সব চেয়ে বড় পূজো!

(তারিণী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন)

তারিণী ॥ (শান্তকণ্ঠে) এ কথাই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম বাবা। কিন্তু তোমার দরিদ্র-নারায়ণকে দেবতা বলে আমি মানতে পারব না—তোমার টাকাও আমি নিতে পারব না!

(উঠে দাঁড়ালেন)

উমা ॥ মা!

তারিণী ॥ আমি যাচ্ছি মেজ বৌ! মোহন, তোমায় আজ আমি আর অভিশাপ দেব না—আশীর্বাদও করব না। শুধু বলে যাই—যে সত্যের ওপর ভর দিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ, তা থেকে তোমার পা যেন কখনো না টলে!

উমা ॥ মা—মা—

(তারিণী বেরিয়ে গেলেন)

ওগো—মা যে রাগ করে চলে গেলেন! মাকে ফেরাও!

রামমোহন ॥ মা ফিরবেন না।

উমা ॥ উনি যে জল-গণ্ডূষও মুখে দিলেন না।

রামমোহন ॥ দেবেন না।

উমা ॥ (উঁকি দিয়ে) ওই যে—ওই যাচ্ছেন! রোদের মধ্যে বুড়ো মানুষ রাস্তায় নেমে গেলেন! বড্ড কষ্ট হবে যে! (মিনতি করে) ওগো, তুমি যাও—তোমার গাড়ি করে যেখানে যেতে চাইছেন—পৌঁছে দাও।

রামমোহন ॥ আমার গাড়িতে উনি চড়বেন না উমা। পথের মধ্যে মরে গেলেও না। আমার মাকে তুমি চেনো না—আমি চিনি।

(উমা নীরব হয়ে রইলেন। রামমোহন দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। স্তব্ধতা। তারপর :)

উমা ॥ আশ্চর্য তোমাদের জেদ! যেমন মা, তেমনি ছেলে!

রামমোহন ॥ ঠিক বলেছ উমা। অমন মা বলেই জীবনে এমন করে দাঁড়াবার জোর আমি পেয়েছি।

(আবার স্তব্ধতা)

উমা ॥ (কিছুক্ষণ পরে) খাবে না?

রামমোহন ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) না—এখন নয়।

উমা ॥ বুঝেছি। মা না খেয়ে এই ভরা দুপুরে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। তাই তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

রামমোহন ॥ একবেলা না খেয়ে কী প্রায়শ্চিত্ত করব? দেশের খবর আমি সব জানি। বিষয়-সম্পত্তির যে অবস্থা—হয়তো এমন অনেকদিনই মাকে না খেয়ে থাকতে হয়! আজ সেজন্যে মিথ্যে সেন্টিমেন্ট দেখিয়ে লাভ নেই। আমার কাজ আছে। এক্ষুনি 'ব্রাহ্মণ-সেবধির' জন্যে আমায় লিখতে বসতে হবে।

উমা ॥ উঃ—ওই তোমার এক কথা। দিনরাত খালি কাজ আর কাজ—লেখা আর লেখা!

রামমোহন ॥ হাঁ—কাজ! অফুরন্ত—অজস্র কাজ! দিনরাত কেন চুরাশি ঘণ্টা হয় না, কেন জীবনটাকে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না হাজার বছর? (পায়চারি করতে করতে) জানো উমা—আমার মরতে ইচ্ছে করে না। কাজের কি শেষ আছে? যেদিকে তাকাই সেইদিকেই অন্ধকার! চারদিক থেকে শাস্ত্র-বিচারের নামে আসছে কুৎসা—বইয়ের পর বই লিখে তার জবাব দিতে হচ্ছে।

ক্রীশ্চানদের সমালোচনা করেছি বলে তারা চটে লাল হয়েছে, কয়েকটা কড়া উত্তর দিয়ে পাদ্রী সাহেবদের মুখ বন্ধ করতে হচ্ছে। ওদিকে অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের দায়িত্ব! খবরের কাগজের ওপর সরকারী আইনের দাপট—সেটা বন্ধ করতে হলে লড়াই করতে হবে সরকারের সঙ্গে। ভূমি-স্বত্ব আইনের সংস্কার চাই—জুরীর বিচার চাই—রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থা সভায় দেশীয় প্রজার প্রতিনিধি চাই—নারীর আইনগত মর্যাদা চাই—উমা—উমা! প্রাচীরের পর প্রাচীর ভাঙতে হবে—দশদিক থেকে আলো আনতে হবে—আনতে হবে মুক্তি। উমা, আমি বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই—হাজার বছর, দশহাজার বছর—

[নেপথ্যে চিৎকার :

বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—]

কে? কে?

[একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রামমোহনের পায়ে আছড়ে পড়ল]

কে তুমি মা? কী হয়েছে?

মেয়েটি ॥ ওরা আমায় মেরে ফেলবে—আমায় পুড়িয়ে মারবে--বাঁচাও আমায়—

রামমোহন ॥ কোনো ভয় নেই—এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু কে পুড়িয়ে মারবে? কারা তারা?

মেয়েটি ॥ ওই যে—নিমতলার শ্মশান থেকে আমার পিছে পিছে ছুটে আসছে। না—না—মরতে চাই না আমি, আমি সতী হতে চাই না—পুড়ে মরতে পারব না আমি!

উমা ॥ (সভয়ে) সতী! পালিয়ে এসেছে!

রামমোহন ॥ হাঁ—সতী! উমা—এর নাম ধর্ম—এই হত্যার নাম সমাজ! এর পরিণাম স্বর্গ!

মেয়েটি ॥ আমায় বাঁচাও বাবা—

রামমোহন ॥ বাঁচাব বই কি মা! আমার আশ্রয়ে যখন এসেছ তখন কেউ আর তোমায় ছুঁতে পারবে না। উমা, ওকে নিয়ে যাও—দোতলার কোণের ঘরটায় রেখে দাও। আর আমি এখুনি বেরুচ্ছি একবার—

উমা ॥ সে কি! এমন অসময়ে কোথায় যাবে? বিশ্রাম করলে না, খেলে না—

রামমোহন ॥ সময় নেই—সময় নেই উমা! জীবনে একটা মুহূর্ত নষ্ট করলে চলবে না। বৌঠানের চিতার কাছে দাঁড়িয়ে একদিন যে শপথ নিয়েছিলাম, প্রায় ভুলতে বসেছিলাম তার কথা। আজ বুঝেছি—একটি মুহূর্ত বিলম্বের অর্থ একটি করে নারী-হত্যা। আমি এখনি যাব দ্বারকানাথের কাছে—সেখান থেকে রাজা মথুরানাথ মল্লিকের বাড়ি, তারপরে যেতে হবে রাজনারায়ণ সেনের ওখানেও। সব কাজ ফেলে আগে সতীদাহ আমায় বন্ধ করতে হবে—বন্ধ করতেই হবে—

—চার—

[রাধাকান্ত দেবের বৈঠকখানা। ১৮২৮ সাল।

প্রকাণ্ড হলঘরে ঢালাও ফরাস। ঝাড়, দেওয়ালগিরি। বিস্তৃত মহমূল্য ফ্রেমে বিলিতী ছবি। ফরাসের ওপর একটি পরিপুষ্ট তাকিয়ায় বুক পেতে রাধাকান্ত দেব একখানা বই পড়ছেন। মুখে আলবোলার সুদীর্ঘ নল। পড়তে পড়তে ভ্রূকুটি করলেন রাধাকান্ত। মুখ থেকে নল নামালেন, একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে দাগাতে লাগলেন বইয়ের পাতায়।

তারিণীচরণ মিত্র ঢুকলেন। পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন রাধাকান্ত।]

রাধাকান্ত॥ এসো তারিণীদা—বোসো।

(তারিণীচরণ বসলেন)

তারিণী॥ কী পড়ছিলে ওটা?

রাধাকান্ত॥ (সোজা হয়ে উঠে বসলেন—মৃদু হেসে এগিয়ে দিলেন বইটা) দেখো।

তারিণী॥ (বইটা তুলে নিয়ে) ও! 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব!' এ তো পুরোনো বই!

রাধাকান্ত॥ বই পুরোনো হলেও যুক্তিগুলো এখনো সমান ধারালো। তা ছাড়া আশ্চর্য আন্তরিকতা লোকটার। শুধু তর্কের জন্যে তর্ক তোলেনি রামমোহন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। বুদ্ধির সঙ্গে ইমোশনের চমৎকার যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

তারিণী॥ কিন্তু হৃদয় নিয়ে কারবার করা তো ধর্মের কাজ নয়। কঠিন তার নীতি, অলংঘ্য তার শাসন।

রাধাকান্ত॥ বিপদ তো সেইখানেই। কি জানো তারিণীদা, মাঝে মাঝে বড় ভয় করে আমার। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে—হয়তো হৃদয়ের দাবি ধর্মকে একদিন পেছনে ফেলেই এগিয়ে যাবে। রামমোহনের মতো এমন সর্বনাশা প্রতিভা আরো গোটাকতক জন্মালে কী যে হবে

কল্পনাও করা যায় না। একা রামমোহনের তোড়েই আমরা হিমসিম খাচ্ছি—এর পরে বান ডাকলে তাকে রোধ করবে কে? শোনো না একবার (পড়তে লাগলেন) "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থানমার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।...ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে—"

তারিণী॥ (বাধা দিলেন) থাক—থাক। এসব কথা শুধু ইংরিজী শেখার ফল। এদেশের মেয়েরা চিরদিন স্বামী-সংসারের সেবা করেই সুখী হয়েছে—নিজেদের তারা বড় করে দেখেনি। ম্লেচ্ছের চোখ দিয়ে দেখলে আদর্শের অমনি একটা অপব্যাখ্যাই হবে বটে!

রাধাকান্ত॥ কিন্তু চিরন্তন আদর্শ আর জীবনের মধ্যে কোথায় যেন বিরোধ ঘনিয়ে আসছে তারিণীদা! দেখা দিচ্ছে ঝড়ের সংকেত। রামমোহন হয়তো তারি অগ্রদূত!

(তারাচাঁদ দত্ত, মতিলাল শীল এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন)

আসুন আসুন দত্ত মশাই, এসো মতিলাল। আরে—আবার দুর্ধর্ষ সম্পাদক ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যেকেও দেখছি যে। বসুন, বসুন সব—

(সকলে বসলেন)

ব্যাপার কী? একেবারে সদলবলে?

তারাচাঁদ ॥ এখনো চুপ করে বসে আছো রাধাকান্ত? একটা উপায় করো! সব যে যায়।

রাধাকান্ত ॥ এত উত্তেজনা কেন দত্ত মশাই? কী যায়?

তারাচাঁদ ॥ ধর্ম।

রাধাকান্ত ॥ রাতারাতি ধর্ম যাবে কোথায়? (হাসলেন) যেতে দিচ্ছেই বা কে? কিন্তু হল কী?

মতিলাল ॥ নতুন করে আর কী হবে? ওদিকে রামমোহন যে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে তোড়জোড় করছে!

রাধাকান্ত ॥ তোড়জোড় শুধু বলছ কেন? বন্ধ করে ফেলেছে ধরে নিতে পারো। এই তো ওর 'প্রবর্তক-নিবর্তক' পড়ছিলাম নতুন করে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে যুক্তিগুলো যা দিয়েছে প্রায় অকাট্য।

ভবানীচরণ ॥ (উত্তেজিতভাবে) যুক্তি দেওয়াটা শক্ত নয় রাধাকান্ত বাবু। ন্যায়ে ফাঁকির অভাব নেই। শাস্ত্রকে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা যে কেউ করতে পারে। চার্বাকও এক সময়ে সব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কণাদের দর্শনও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাতে মিথ্যে হয়ে যায়নি। তাই প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'সমাচার-চন্দ্রিকায়' কলম ধরেছি আমি। দেখা যাক, সনাতন ধর্মের জয় হয়, না সতীদাহ বিরোধ আইন পাশ হয়ে যায়!

রাধাকান্ত ॥ রামমোহনের কলমও কম জোরালো নয়। আমার সন্দেহ হয়, ওতেই হয়তো অর্ধেক বাজী জিতে নেবে।

ভবানীচরণ ॥ রামমোহনের লেখা! ও আবার গদ্য নাকি! দশ বছর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাকরেদি করলে তবে যদি লিখতে শেখে।

রাধাকান্ত ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই একটা নিখুঁত পণ্ডিতী গদ্য, আর একটা প্রাণের ভাষা। মুশ্‌কিলটা

কোথায় জানো ভবানীচরণ? পণ্ডিতী লেখা পড়ে লোকে হাততালি দেয়, কিন্তু প্রাণের ডাক শুনলে তখনি সাড়া দিয়ে ওঠে।

মতিলাল॥ (অধৈর্যভাবে) গল্পতত্ত্ব এখন থাকুক। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে কাজে না নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারিণী॥ আরে, শর্ষের মধ্যেই যে ভূতে বাসা করেছে। লড়াইটা যে এখন ঘরের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে। এই তো আমাদের তারাচাঁদ দত্ত মশাই—ম্লেচ্ছ রামমোহন বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করেন—আবার ওঁরই ছেলে হরিহর দিনরাত গিয়ে রামমোহনের ব্রহ্মসভায় বসে আছে।

তারাচাঁদ॥ (ক্রুদ্ধ হয়ে) হতভাগা—নচ্ছার! ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব আমি—বাড়ি থেকে বের করে দেব। চাবকে তুলে দেব পিঠের চামড়া।

ভবানীচরণ॥ কাগজে আমরা লিখছি, আরো লিখব।

রাধাকান্ত॥ কাগজের লড়াইতে যে ঠিক পেরে ওঠা যাবে না, সে তো বারে বারেই প্রমাণ হয়ে গেছে! বড় বড় সব দিক্‌পাল পণ্ডিত থেকে ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়ার অমন জুঁদে মার্শম্যান-টাইটলার সাহেব সব একেবারে ঠাণ্ডা। আর মুখও তেমনি। প্রকাশ্য বিচারসভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কী অবস্থা করে ছাড়ল, দেখলেন তো? যাই বলুন—লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত।

তারিণী॥ ওই পাণ্ডিত্যই কাল হয়েছে দেখছি।

রাধাকান্ত॥ তা যা বলেছ তারিণীদা। লড়াইটা একেবারে 'আন্‌ইকুয়্যাল ম্যাচ্'। ও যদি জ্ঞানের সমুদ্র হয়, আমরা প্রায় খানা-ডোবার সামিল। পৃথিবীতে এমন কোনো শাস্ত্র নেই, যা ওর পড়া নয়। ভাষাই তো শিখেছে কমসে কম সাত আটটা।

মতিলাল ॥ আপনি যদি এভাবে রামমোহনকে সমর্থন করেন, তা হলে আমরা জোর পাই কোত্থেকে বলুন তো?

রাধাকান্ত ॥ ভুল বুঝছ কেন—সমর্থন আমি করছি না। যুদ্ধ করতে গেলে শত্রুর শক্তির পরিমাণটা জেনে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কর্মশক্তিও দেখো একবার। কী করল, কী না করল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, Western Education—কী নয়? আত্মীয় সভা করল, অ্যাডামের সঙ্গে ইউনিট্যারিয়ান কমিটি করে গোঁড়া ক্রীশ্চানদের সঙ্গে লড়াই চালালো। তারপরে আবার এই ব্রহ্মসভার পত্তন। দিনের পর দিন শক্তি বাড়ছে লোকটার—ওদিকে আবার সতীদাহ নিয়ে খোদ বেণ্টিঙ্ককে গিয়ে পাকড়েছে।

ভবানী ॥ বেণ্টিঙ্ক সম্বন্ধে যা শুনেছি সে কিন্তু সুবিধের নয়। ভারতবর্ষের সংস্কার করবার নাকি মতলব আছে তলে তলে।

তারাচাঁদ ॥ (মুখভঙ্গি করে) মা-র চেয়ে মাসীর দরদ! আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা আছি—তোমাদের নাক গলানো কেন বাপু। লাট আছো, লাট হয়েই থাকো। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সাজতে যাও কেন?

মতিলাল ॥ কিন্তু রামমোহন আবার ওই বেণ্টিঙ্ককে দিয়ে সতী বিলটা পাশ করিয়ে না নেয়।

রাধাকান্ত ॥ অসম্ভব নয়। আমার সেইরকম সন্দেহই হচ্ছে।

ভবানী ॥ কিছুতেই নয়। একেবারে তোলপাড় করে ফেলব চারদিক।

তারাচাঁদ ॥ শুধু লিখে না হয়, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। ব্রহ্ম সমাজ! ওই সমাজই হয়েছে বিষের জড়। 'একমেবাদ্বিতীয়মের' উপাসনা হচ্ছে ওখানে বসে। আবার মুখে বলে, 'আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়—এখানে সকলের ঠাঁই আছে।' বুলি শুনলে ব্রহ্মতালু

অবধি জলে যায়। শোনো রাধাকান্ত, ওসব লেখালেখির কাজ নয়। মূর্খের জন্যে লাঠ্যৌষধিই প্রশস্ত।

(জয়কৃষ্ণ সিংহ ঢুকলেন)

রাধাকান্ত॥ এই যে—মেঘ না চাইতেই জল! জয়কৃষ্ণ সিংহ এসে পড়েছেন।

মতিলাল॥ ওঁর তো আবার ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে চোখ বুজে বসা অভ্যেস আছে। কী মশাই, পরম ব্রহ্মের সন্ধানে কতদূর এগোলেন?

জয়কৃষ্ণ॥ (বসতে বসতে) পরম ব্রহ্ম—হাঃ হাঃ হাঃ। (অট্টহাসি করলেন) যা বলেছেন! বড় ভালো লাগে ওদের ভড়ং! সেই রাম বিদ্যেবাগীশটা আছে না? সে হল আচার্য—ব্যাখ্যা করে। বাওজী বলে খোট্টাটা পড়ে উপনিষদ। একটা মুসলমানকেও জুটিয়েছে—তার কাজ হল পাখোয়াজ বাজানো। বিষ্টু চক্কোত্তি চোখ বুজে রামমোহনের বেহ্ম-সঙ্গীত গায়।

রাধাকান্ত॥ খুব জমেছে তা হলে?

জয়কৃষ্ণ॥ সে আর বলতে! রগড় কত! তারাচাঁদ চক্কোত্তি, চন্দ্রশেখর দেব, দ্বারকা ঠাকুর, কালী মুন্সী, ভৈরব দত্ত, মথুর মল্লিক—নিরাকারের প্রেমে কেঁদে একেবারে গড়াগড়ি। ওদিকে গান হচ্ছে: 'নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন—' এদিকে সমানে মদ্যপান আর গো-মাস ভক্ষণ চলছে।

মতিলাল॥
তারিণীচরণ॥ } ছিঃ—ছিঃ!

তারাচাঁদ॥ উঃ—কী পাষণ্ড! এখুনি ওদের নিপাত করা কর্তব্য। ধর্ম কি রসাতলে গেছে? কল্কি-অবতার কি এখনো ঘুমিয়ে?

রাধাকান্ত॥ (অস্বস্তিভরে) দেখুন জয়কৃষ্ণ বাবু, ব্রহ্মসভার নিন্দে আমরা

অন্যভাবে যা খুশি করতে পারি। কিন্তু বেশি নিচে গেলে নিজেদেরই কি ছোট করা হয় না?

জয়কৃষ্ণ ॥ (বিস্মিত) অর্থাৎ?

রাধাকান্ত ॥ গো-মাংস ভক্ষণের কথাটা সর্বৈব মিথ্যে এ আমরা সবাই জানি। আর ব্রহ্মসভায় মদ্যপান চলে—একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

তারিণী ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও রামমোহন মদ খান না?

রাধাকান্ত ॥ তা বলব কেন? মদ খাওয়ার উপকারিতা তিনি নিজেই তো প্রচার করেছেন তাঁর 'কায়স্থের সঙ্গে বিচারে'। ওটা তাঁর মতে স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকেরই যে ও কাজটা প্রচুর পরিমাণেই চলে, তাও কি অস্বীকার করা যায়? ব্রহ্মসভার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না তা ঠিক। কিন্তু ওখানে গো-মাংস আর মদের আড্ডা বসেছে— এ সব মিথ্যে নোংরামির ঢাক পিটিয়ে লাভ কী?

ভবানী ॥ আপনার একটা অন্যায় পক্ষপাত আছে ওদের ওপর।

রাধাকান্ত ॥ পক্ষপাতের কথা হচ্ছে না ভবানীচরণ। শত্রু যেই হোক, তাকে কাপুরুষের মত মিথ্যে অপবাদ দেওয়া আমি সমর্থন করি না।

(চাকর ফরসীর তামাক বদলে দিয়ে গেল। নলটা মুখে তুলে নিয়ে খানিক ধোঁয়া ছাড়লেন রাধাকান্ত।)

রামমোহন হিন্দুধর্মের বিপক্ষে যাচ্ছেন। দাঁড়াতেই হবে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। বীরের মতোই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

মতিলাল ॥ বীর!

তারাচাঁদ ॥ (মুখভঙ্গি করলেন) ওই বীরদের জন্যে একটিমাত্র ব্যবস্থাই আছে। সে হল লাঠ্যৌষধি!

জয়কৃষ্ণ ॥ (ক্রুদ্ধ) ভাব দেখে সন্দেহ হচ্ছে কোন্‌দিন রাধাকান্ত দেব গিয়ে ব্রহ্ম-সভার খাতায় নাম লেখাবেন।

রাধাকান্ত ॥ (উত্তেজিত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। নামালেন ফরসীর নল) ব্রহ্ম-সভায় নাম লেখাবার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন সিঙ্গি মশাই, আজ সারা দেশে অমন তেজী, অমন স্বাধীন মানুষ আর দুটি নেই ?

জয়কৃষ্ণ ॥ (ব্যঙ্গভরে) তা বটে !

রাধাকান্ত ॥ (আরও উত্তেজিত) ঠাট্টার কথা নয়। নেপল্‌সের স্বাধীনতা-লড়াইয়ের যখন গলা টিপে ধরল অস্ট্রিয়ার সৈন্য, তখন সিল্‌ক বাকিংহামকে একমাত্র তিনিই লিখতে পেরেছিলেন : "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful।" দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলো যেদিন স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল—সেদিন ভারতবর্ষে এই একটি মানুষই প্রীতিভোজ ডেকে সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এ দেশে ফরাসী বিপ্লবকে তিনি সব চেয়ে অভ্যর্থনা করেছেন।

তারিণী ॥ (বিব্রত) সে সব তো আমরা জানিই রাধাকান্ত।

রাধাকান্ত ॥ না, সবটা জানিনা। এই তো সম্পাদক ভবানীচরণ রয়েছেন। উনি জার্ণালিস্ট্—কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে 'মিরাৎ উল্ আখবার' রামমোহনই বন্ধ করে দিয়েছেন—আর কারো তো সে সাহস হয়নি !

ভবানী ॥ কিন্তু—

রাধাকান্ত ॥ কিন্তু নেই ভবানীচরণ ! আজ আমরা পোলিটিক্‌সের বুলি শিখছি, কিন্তু সে চেতনা এনে দিয়েছে কে ? আমরা জমিদার—প্রজার রক্ত শুষে খাই—কিন্তু প্রজার উন্নতির জন্যে আন্দোলন তো তিনি একাই করছেন। হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার তুলে ধরেছেন তিনিই। গরীবের পক্ষ থেকে অত্যাচারী বড়লোককে শাস্তি দেবার

কথা তাঁরই। সিঙ্গি মশাই, তাঁর ধর্মমতের বিরোধিতা যা খুশি আমরা করতে পারি। কিন্তু একদিন যখন ইতিহাস লেখা হবে—তখন সে ইতিহাসে হয়তো আমরা ঠাঁই পাব না। আর রামমোহন সম্বন্ধে হয়তো সেদিন ভারতবর্ষ জানবে: "He is the maker of new India !"

(উত্তেজনায় রাধাকান্ত কাঁপতে লাগলেন। সমস্ত ঘর স্তব্ধ হয়ে রইল)

তারিণী ॥ (কিছুক্ষণ পরে) রাধাকান্ত—কী হচ্ছে এ সব ?

রাধাকান্ত ॥ (নিজেকে সামলে নিয়ে) ভয় নেই তারিণীদা—নিশ্চিন্ত থাকুন। (হাসলেন) ব্যক্তি রামমোহনকে আমরা যত শ্রদ্ধাই করি, ধর্ম আর সমাজের বিচারে তিনি আমাদের চিরশত্রু। কথা হচ্ছে: Even the Devil must get his due ! (হাসলেন) যাক সে সব। আসল কথাই চলুক। রামমোহন তো সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের কর্তব্য কী ?

ভবানী ॥ কাগজে আগুন ছুটিয়ে দেব। জ্বালাময়ী সমালোচনা লিখব।

রাধাকান্ত ॥ উঁহু, ওতে হবে না। শুধু কাগজের কাজ নয়। আরো কিছু চাই—আরো concrete suggestions—

(রামকমল সেন ঢুকলেন)

রামকমল ॥ ভালো খবর আছে মশাই—খাইয়ে দিন।

রাধাকান্ত ॥ আরে—রামকমল সেন যে! এগ্রিকালচারের কোনো সুখবর নাকি ?

রামকমল ॥ এগ্রিকালচার নয়—এগ্রিকালচার নয়। হিন্দু কালচার! ব্রাহ্মসমাজের দলে ভাঙন ধরেছে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও ভেগেছে।

ভবানী ॥ (সবিস্ময়ে) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ! সে কি! সে যে রামমোহনের ডান হাত! ওর সেই বিটলে গুরুদেব হরিহরানন্দের আপন ভাই।

জয়কৃষ্ণ ॥ শেষকালে বেহ্ম-সমাজের আচার্যিই চম্পটং !

রামকমল ॥ এতদিন সয়ে ছিল—শাস্ত্রটাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু কতটা বরদাস্ত করবে আর! সতীদাহ-বিলের তোড়জোড় দেখেই সরে পড়েছে। রামমোহন খুব দমে গেছেন শুনলাম।

মতিলাল ॥ একটা বড় কাতলাই তবে জাল কাটল। যাবে—এমনি করেই সব যাবে।

রাধাকান্ত ॥ (চিন্তিত) হাঁ, সকলের শক্তি সমান নয়। রামমোহন রায় সবাই হন না।

তারাচাঁদ ॥ জয় মা কালীঘাটের কালী! এবার যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

রাধাকান্ত ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) কিন্তু আমি দেখছি না। পৃথিবীর সবাই যদি সরেও দাঁড়ায়—তবু একা লড়বার শক্তি নিয়েই এগিয়ে চলবে রামমোহন রায়। সে যাক্—আমাদের কাজ আমরা করি। আসুন, উঠে পড়েই লাগা যাক্—

—পাঁচ—

[ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাসাদ। খাস কামরায় একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন গবর্ণর-জেনারেল ও রামমোহন রায়। লাটসাহেবের মর্যাদা অনুসারে ঘরখানা সাজানো। সময়: বিকেল।]

বেন্টিঙ্ক ॥ কাল আপনাকে আমি অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

রামমোহন ॥ আমি অত্যন্ত দুঃখিত ইয়োর এক্সেলেন্সি! বিশেষ কাজেই আমি আসতে পারি নি।

বেন্টিঙ্ক ॥ আমি জানি রায়, কী জন্য আপনি আসেন নাই। কাল যখন আমার এ-ডি-কং আপনার নিকট হইয়া ফিরিয়া আমাকে জানাইল যে আপনি আসিবেন না, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তুমি তাঁহাকে কী বলিয়াছিলে? সে কহিল: বলিয়াছিলাম, 'ভারতের গবর্ণর জেনারেল মাননীয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ডাকিয়াছেন।' তাই আজ তাহাকে আদেশ দিলাম, গিয়া বলিবে: 'মিস্টার বেন্টিঙ্ক আপনার সহিত কিছু আলাপ করিয়া সুখী হইতে চান।' সেই জন্যেই আপান আসিয়াছেন—নহিলে আসিতেন না।

রামমোহন ॥ (অপ্রতিভ) না—ঠিক তা নয়—

বেন্টিঙ্ক ॥ আপনি লজ্জা পাইবেন না রামমোহন। I highly appreciate your sentiment! এ দেশীয় nativeদিগের নিকট হইতে এইরূপ spirit-ই আমি প্রত্যাশা করি। বন্ধুভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, সেখানে পদমর্যাদার সুযোগ লওয়া আমারই অপরাধ হইয়াছে। I apologise!

রামমোহন ॥ My Lord, দুঃখের বিষয়, আপনার মতো গবর্ণরজেনারেল এ দেশে বেশি আসেন না। অধিকাংশই ওয়ারেন হেষ্টিংসের সগোত্র। কিন্তু সে কথা যাক। সতীদাহ সম্পর্কে কাগজপত্রগুলো আপনি ভালো করে দেখেছেন কি?

বেণ্টিঙ্ক ॥ দেখিয়াছি। ইহা অত্যন্ত বীভৎস প্রথা। ভারতবর্ষের মতো এমন advanced দেশে কী করিয়া ইহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই আশ্চর্য। বেলি সাহেবের রিপোর্ট আমি পড়িতেছিলাম। দেখিলাম, এক 1827-এই কলিকাতা এবং অন্য কয়েকটি জেলায় প্রায় সাড়ে ছয় শত সতীদাহ ঘটিয়াছে।

রামমোহন ॥ এবং এদের মধ্যে ছয়শোকেই জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। My Lord—দেশের আইন-শৃংখলার রক্ষক হয়েও এই হত্যাকাণ্ড আপনারা বন্ধ করেন না!

বেণ্টিঙ্ক ॥ আমরা কী করিতে পারি বলুন! আমরা বিদেশী—ক্রীশ্চান। আপনাদের ধর্মে তো আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না! অথচ জেলার পর জেলা হইতে পুলিস রিপোর্ট আসিতেছে! তাহাদের চোখের সামনে widowকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হয়—সে পলাইয়া গেলে ধরিয়া আনিয়া আগুনে চাপানো হয়! কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নয় বলিয়া এমন horrible sightও তাহাদের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়।

রামমোহন ॥ ধর্ম! না—এ ধর্ম নয়। শাস্ত্রে এমন কোনও উল্লেখ নেই যে অনিচ্ছুক সতীকে সহমরণে যেতেই হবে। তা ছাড়া রক্ষণশীল সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সতীদাহের বিপক্ষেই মত দিয়েছেন।

বেণ্টিঙ্ক ॥ আপনাদের ধর্মের খবর আপনারাই জানেন। আমাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। এই দেখুন—(কাগজপত্র উল্‌টে) লর্ড ওয়েলেসলির time হইতেই আমরা move করিতেছি। সেই সময় নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতদের কাছে এ সম্পর্কে opinion চাওয়া হয়। পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা যাহা জানাইয়াছিলেন, তাহা দেখুন—

(কাগজগুলি রামমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন)

রামমোহন ॥ (দ্রুত চোখ বুলিয়ে) My Lord, এ থেকে আমার যুক্তিই প্রমাণ হচ্ছে। ঘনশ্যাম শর্মা বলেছেন, রজঃস্বলা, অন্তঃসত্ত্বা, নাবালিকা বা শিশু জননীর সহমরণে যাওয়া স্পষ্টত অশাস্ত্রীয়। তা ছাড়া কোনো রকম মাদক ইত্যাদি খাইয়ে অনিচ্ছুক সতীকে সহমৃতা করাও বে-আইনী। অথচ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে। যাদের এমনিতে মাদক খাওয়ানো হয় না—তারা মাতাল হয়ে ধর্মের মদ খেয়ে। মারাত্মক এই ধর্মের নেশা! এমনও হয়েছে —শ্মশানে গিয়ে চেষ্টা করেও সতীদাহ আটকাতে পারিনি—নেশার ঝোঁকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে মেয়েরা।

বেন্টিঙ্ক ॥ তা ছাড়া একটা কথাও আছে। সংকল্প করিয়া যদি কোনো নারী সহমৃতা না হয়, আপনাদের শাস্ত্রমতে তাহার অনন্ত নরক—

রামমোহন ॥ সংকল্প! সদ্য স্বামীর শোকে পাগল হয়ে সহমরণের সংকল্প করা অনেক সহজ My lord। কিন্তু আগুনে পুড়ে মরা অত সহজ নয়। আর তা ছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে বিধবাকে চিতায় চড়িয়ে নিষ্কণ্টকভাবে তার সম্পত্তি দখল করা। My lord, from the standpoint of humanity জিনিসটাকে আপনি বিচার করুন। আফ্রিকার লোকের ধর্ম নরমাংস খাওয়া—কিন্তু সে ধর্মকে আপনারা কি স্বীকার করতে রাজী হবেন? তাদের সে ধর্মকে তো আপনারা বন্দুকের গুলিই উপহার দেন। ধর্ম যদি barbarism হয়, তা হলে সে ধর্মে আঘাত করা যে আরো greater religion, My lord!

বেন্টিঙ্ক ॥ হাঁ—গোঁড়ামির পরিণাম কী ভয়ানক হইতে পারে, তাহা ইংল্যাণ্ডেও আমরা জানি। এক সময়ে আমাদের দেশে witchcraft সম্বন্ধে লোকের এমন prejudice বাড়িয়াছিল যে হাজার হাজার

বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডাইনি সন্দেহ করিয়া hang করা হইয়াছিল—many were burnt alive !

রামমোহন ॥ সে প্রথা যদি আপনারা বন্ধ করে থাকেন, সতীদাহই বা কেন করবেন না ? My lord—এই পৈশাচিকতা যে করেই হোক রোধ করতে হবে। এবং আপনারা ইচ্ছা করলেই তা হতে পারে।

বেণ্টিঙ্ক ॥ ইচ্ছা ! আপনি জানেন না রামমোহন—What I feel ! এই তো recently একখানি বই পড়িলাম : "The Suttee's Cry to Britain।" লিখিয়াছেন মিস্টার জে, পেগ্স। What a horror ! রামমোহন, আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—I must abolish this nuisance !

রামমোহন ॥ সাহায্য ! I stake my life—I stake my everything for it !

বেণ্টিঙ্ক ॥ You are great রামমোহন। আপনি মহৎ। আপনার অন্য সমস্ত activityর কথাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর কী জানেন ? আপনাদেরই দেশের সমস্ত বড় লোক—যেমন ধরুন, রাধাকান্ত দেব—মহারাজা গিরিশচন্দ্র, মহারাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার বিরোধিতা করিতেছেন।

রামমোহন ॥ শুধু বিরোধিতা নয়—আমার ওপর শারীরিক আক্রমণের চেষ্টাও চলছে। অন্ধকারে থেকে যারা কানা হয়ে গেছে, আলো তাদের সহ্য হয় না। কিন্তু প্যাঁচাদের জন্যে দুর্ভাবনা আমার নেই—My lord, সতীদাহ আপনি বন্ধ করুন। এ শুধু আমার কথা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষ থেকেই আমি বলছি।

বেণ্টিঙ্ক ॥ আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(বেয়ারা এসে একখানা কাগজ দিল, বেণ্টিঙ্ক পড়লেন)

যাও—পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে আসিতে বলো।

রামমোহন ॥ আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে, আমি উঠি।

বেণ্টিঙ্ক ॥ না-না, বিশেষ কিছু নয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের rebelদের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়াছে—সেই বিষয়ে military officerদের সঙ্গে কিছু discuss করিব। সম্ভবত সৈন্য পাঠাইতে হইবে।

রামমোহন ॥ ওয়াহাবী আন্দোলন!

বেণ্টিঙ্ক ॥ শুনিয়াছেন আশা করি। ইহা একটি communal movement। তিতুমীর বলিয়া একটা fanatic নদীয়া-ফরিদপুর অঞ্চলে খুব disturbance সৃষ্টি করিতেছে—

রামমোহন ॥ Communal movement! No my lord, এ সম্বন্ধে আমি একমত নই। এ আন্দোলন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ! এ স্বাধীনতার সংগ্রাম! কিন্তু সব চাইতে painful কী জানেন My Lord? আজ দেশে ধর্মে ধর্মে বিরোধ—আচারে-বিচারে সংঘাত। এক হিন্দুর মধ্যেই অজস্র শাখা-প্রশাখা, হিন্দু-মুসলমানে তো সমুদ্রের ব্যবধান। তাই এ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকবে—এর পরিণাম ব্যর্থতাতেই তলিয়ে যাবে! কিন্তু আজ যদি সারা দেশে একটি মাত্র জাত থাকত—থাকত এক ধর্মে বিশ্বাসী একটি মাত্র ভারতবাসী—তা হলে—তা হলে—! কিন্তু কী হবে সে কথা বলে? সাধনা আমরা শুরু করেছি—আমার ভারতবর্ষ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাজাতির প্রতিষ্ঠা। যদি কোনো দিন আমার স্বপ্ন সফল হয়—তবে সেদিন তা ওয়াহাবী আন্দোলনেই ফুরিয়ে যাবে না—তা হবে সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রাম!

বেণ্টিঙ্ক ॥ কিন্তু ইহা তো পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলন নয়। ইহা শুধুই rebellion।

রামমোহন ॥ Rebellion থেকেই Revolution আসে। Excuse

me My Lord, আপনাদের সমস্ত মহত্বকে স্বীকার করেও আমি বলব—সে Revolution-এর ভূমিকা তৈরি হচ্ছে দেশে। "India for Indians"—এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। বিদেশী শাসনকে একদিন এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে—সেদিন এই ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে ভারতবাসীর জন্যেই। সে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঠাঁই পাবে—ইংরেজ ভারতীয়ের ভেদ থাকবে না—ক্রীশ্চান-মুসলমান-বৌদ্ধ-হিন্দুর এক জাতি গড়ে উঠবে। সে কবে হবে জানি না—কিন্তু My Lord, it will come—it must come!

বেণ্টিঙ্ক॥ গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে ইহা রাজদ্রোহ। কিন্তু আমি বন্ধু বেণ্টিঙ্ক বলিতেছি—Yes Rammohan, it will come—it must come!

—পর্দা পড়ল—

চতুর্থ অঙ্ক

—এক—

[ভূতপূর্ব মহাবিদ্যালয়, অধুনা হিন্দু কলেজের একটি ঘর। সভা বসেছে। সতীদাহ নিবারণ বিল পাশ হয়ে গেছে, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জড়ো হয়েছেন কলকাতার জনকয়েক শ্রেষ্ঠ সমাজপতি। তাঁদের মধ্যে আছেন রামগোপাল মল্লিক, তারিণীচরণ মিত্র, তারাচাঁদ দত্ত, রামকমল সেন, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ভৈরব মল্লিক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরনাথ তর্কভূষণ এবং রাধাকান্ত দেব।

১৮৩০ সালের প্রথম দিক। সময়: সকাল।]

কালীকৃষ্ণ॥ সতীবিল পাশ হয়েছে বলে সাহেবরা সভা করে বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ দিয়েছে! দিক। ওরা বিধর্মী, আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারলেই ওরা খুশি হয়। তাই বলে রামমোহনের এত সাহস যে বাড়ী বয়ে মানপত্র দিয়ে আসে বেণ্টিঙ্ককে!

ভৈরব॥ আপনারা মিথ্যেই সমাজপতি বলে গর্ব করেন মহারাজ কালীকৃষ্ণ। সতীবিল তো শেষ পর্যন্ত পাশ করিয়ে নিলেই—আপনারা রুখতে পারলেন? এর পরে রামমোহন রায় হাতে আপনাদের মাথা কাটবে—দেখে নেবেন।

কালীকৃষ্ণ॥ (সরোষে) হুঁ, দেখছি। মানপত্র দিতে কে কে গিয়েছিল হে ভবানীচরণ?

ভবানী॥ টাকীর কালীনাথ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠ রায়, কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল—

হরনাথ॥ কী! ভূ-কৈলাসের সত্যকিঙ্কর ঘোষাল! অমন পরমভক্ত রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বংশধর হয়ে শেষ পর্যন্ত সেও ওই ম্লেচ্ছের দলে গিয়ে ভিড়েছে!

কালীকৃষ্ণ॥ হুঁ আর কে কে ছিল ভবানীচরণ?

ভবানী॥ রামমোহন তো ছিলই, সঙ্গে সাঁকরেদ হরিহর দত্ত। কালীনাথ বাংলায় অভিনন্দন দিলে আর হরিহর সেইটে ইংরেজিতে পড়ে শোনালে।

রাধাকান্ত॥ (তারাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন) দত্ত মশাই, শুনলেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড?

তারাচাঁদ॥ (সরোষে চিৎকার করে) ত্যাজ্যপুত্র করেছি হারামজাদাকে —বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি! ব্যাটা আমার ছেলে হয়ে এমন অধঃপাতে গেল! বলে, সতীদাহ বিল পাশ হয়ে দেশ একেবারে চতুর্ভুজ হয়েছে! নচ্ছার—শূয়োরের বাচ্চা! ফের যদি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকে তো ওকে আমি চাকর দিয়ে জুতোব!

তারিণী॥ মিথ্যে হরিহরকে তাড়িয়ে তো কিছু লাভ হবেনা দত্ত মশাই, বিষের ঝাড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে হবে।

কালীকৃষ্ণ॥ (দাঁতে দাঁত চেপে) হুঁ, ঝাড়শুদ্ধুই ওপড়াতে হবে। সেই জন্যেই তো আমাদের এই ধর্মসভা। ওহে রামকমল, আমাদের সেই দরখাস্তটার কিছু হল?

রামকমল॥ (হতাশভাবে) ও কিছুই হবে না। এখন প্রিভি কাউন্সিল অবধি লড়া পর্যন্ত ছাড়া আর পথ নেই!

হরনাথ॥ স্পর্ধা। মহারাজা শ্রিরিশচন্দ্র বাহাদুর থেকে শুরু করে শহরের আটশো লোক তাতে সই দিয়েছেন। নির্ণয়সিন্ধু, সুধীতত্ত্ব, মনু, দত্তক-চন্দ্রিকা—সব কিছু থেকে শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে দিয়েছি। তবু সতী বিল পাশ করাবে? তোমরা কি সব মরেছ?

ভবানী॥ তর্কভূষণ মশাই। এখনো আশা ছাড়বার কিছু হয়নি। এতবড় অন্যায় দেখে দু-চারজন সায়েবের পর্যন্ত টনক নড়ছে। শুধু আমাদের 'সমাচার-চন্দ্রিকা'তেই যে আমরা লিখছি তা নয়, 'জন বুলে'র রেভারেণ্ড ব্রাইস্ পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করছেন।

কালীকৃষ্ণ ॥ ব্রাইস্‌কে আমার বিশ্বাস নেই—কী এতটা মতলব আছে ওর তলে তলে। ওই প্রিভি কাউন্সিলেই আপীল করতে হবে। ওহে ভৈরবধর, তুমি তো ধর্মসভার ট্রেজারার—কত টাকা উঠল ?

ভৈরব ॥ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার।

তারাচাঁদ ॥ আরো চাই। দরকার হলে আমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেব। বড় ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি—আর আমার কিসের মায়া ? (উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন) শুয়োরটাকে একবার হাতের কাছে পাই তো—

তারিণী ॥ মিথ্যে উত্তেজিত হবেন না দত্ত মশাই, এখনো সময় আছে। ওহে রাধাকান্ত, তোমার এ্যাটর্নী যে আসবে বলেছিল আজ। কখন আসবে ?

রাধাকান্ত ॥ (ঘড়ি দেখে) সাড়ে ন'টায় আসবার কথা—প্রায় সময় হয়ে এল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। নীলমণি তাকে আনতে গেছে।

কালীকৃষ্ণ ॥ এ্যাটর্নীটা আবার কে ?

তারিণী ॥ বেথি সাহেব। ফ্রান্সিস্ বেথি।

তারাচাঁদ ॥ লোকটা সায়েব। আমাদের হয়ে যে পুরোপুরি লড়বে, এমন ভরসা হয় না।

ভবানী ॥ কেন লড়বে না ? সব সাহেবই কি বেন্টিঙ্ক কিংবা মার্টিনের মতো ? ওদের মধ্যে দু-চারজন ভালো লোকও আছে। যেমন ব্রাইস্ সাহেব, যেমন আমাদের বেথি।

কালীকৃষ্ণ ॥ যাই বলো, ব্রাইস্‌কে আমার সুবিধে মনে হয় না। মহা পাজী লোক, তলায় তলায় কিছু একটা মতলব আঁটছে নিশ্চয় !

[ইংরেজ অ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথিকে নিয়ে নীলমণি দে প্রবেশ করলেন]

রাধাকান্ত॥ এসো নীলমণি, এই যে, এসো বেথি।

বেথি॥ গুড মর্ণিং!

রাধাকান্ত॥ আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ইনি আমাদের ধর্মসভার সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি কোষাধ্যক্ষ ভৈরবধর মল্লিক, ইনি পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ, আর বাকি সকলের সঙ্গে তোমার তো পরিচয় আছেই। আর ইনি হলেন এ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথি।

[বেথি করমর্দন শেষ করল, তারপর আসন নিলে]

কালীকৃষ্ণ॥ আপনি আমাদের ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহ বিলের বিরুদ্ধে আবেদন নিয়ে বিলেতে যেতে প্রস্তুত আছেন?

বেথি॥ অবশ্য॥ মোস্ট্ গ্ল্যাডলি!

হরনাথ॥ আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্য সমর্থন করেন?

বেথি॥ কেন করিব না? আমাদের ইংলিশ ল অত্যন্ত লিবারাল্। সেখানে প্রত্যেকেরই ধর্মের স্বাধীনতা আছে। অন্যায়ভাবে অন্যের রিলিজিয়স্ প্র্যাকটিসে কেহই ইন্টারফিয়ার করিতে পারে না।

কালীকৃষ্ণ॥ তা হলে কি আপনি মনে করেন যে সতীদাহ বিল অন্যায়?

বেথি॥ অবশ্যই অন্যায়! গুরুতর অন্যায়! যে কোনো অনেস্ট্ ইংলিশম্যানও ইহাই মনে করেন। দেখুন না, হোরেস্ হেম্যান উইলসনের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহা স্বীকার করেন নাই।

ভবানী॥ টাকার ব্যবস্থা আমাদের হয়ে গেছে। আপনি কবে রওনা হতে চান? বেশি দেরি করলে আবার—

বেথি॥ ওহো না—না, দেরি হইবে কেন? আমি খোঁজ করিয়াছি, দুই মাসের আগে জাহাজে প্যাসেজ পাওয়া যাইবে না। ইহার মধ্যে আমরা কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া লইব।

হরনাথ ॥ বিলেতে গিয়ে আপনি আমাদের জন্যে যথাসাধ্য করবেন আশা করি।

বেথি ॥ নিশ্চয়। You see, I am an Englishman—আমরা সত্যের জন্যে সব সময় লড়িয়া থাকি—to our last drop of blood! আপনারা আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। (ঘড়ি দেখে) Well মহারাজা, আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাতে ইম্পর্ট্যাণ্ট কেস্ আছে। পরে আবার আসিব।

রাধাকান্ত ॥ কাজ থাকলে আটকাব না। সকলের সামনে তোমার মতটা জানবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। আচ্ছা—এসো তুমি।

বেথি ॥ থ্যাঙ্ক ইউ। (উঠে দাঁড়ালে) কিছু ভাবিবেন না, Sutee Bill আমি নিশ্চয় রদ করিতে পারিব। আচ্ছা—So long, good-bye—

[বেথি বেরিয়ে গেল]

কালীকৃষ্ণ ॥ হুঁ, কাজের লোক মনে হচ্ছে। একে দিয়ে কিছু হতেও পারে—হাজার হোক বীরের জাত তো! ওহে রাধাকান্ত, আজ ওঠা যাক তা হলে। (উঠলেন, হরনাথকে বললেন) তর্কভূষণ মশাই, আপনি তো আমাদের ওদিকেই যাবেন বলেছিলেন। আমার গাড়িতেই চলুন।

হরনাথ ॥ চলুন। (ভবানীচরণকে) আসি তা হলে। কিন্তু তোমার ওপরেই সব ভরসা ভবানীচরণ। তোমার বুদ্ধি আর কলমের জোর।

ভবানী ॥ আমরাও যাব। চলুন, একসঙ্গেই বেরুই—

[রাধাকান্ত এবং তারিণীচরণ ছাড়া সবাই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন]

তারাচাঁদ ॥ (থেমে দাঁড়িয়ে) আপীলই বলো আর বেথি সাহেবই বলো—সকলের সেরা হল লাঠৌষধি। ওই রামমোহন রায় আর তার দলবলকে ধরে জুৎমতো ঠ্যাঙাতে পারলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রামকমল ॥ (মৃদু হাসলেন) কিছু ভাববেন না দত্ত মশাই। দেশের লোকে যা খেপেছে ও ব্যবস্থাটা তারাই করবে এখন।

(সকলে বেরিয়ে গেলেন। তারিণীচরণও উঠে দাঁড়ালেন। শুধু নিজের আসনে বসে রইলেন রাধাকান্ত)

তারিণী ॥ কী হল রাধাকান্ত, উঠবে না?

রাধাকান্ত ॥ (একটু হাসলেন) বেথি সাহেবের কথা ভাবছিলাম তারিণীদা!

তারিণী ॥ কী ব্যাপার?

রাধাকান্ত ॥ উইলসন ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন, আমাদের ওপর তাঁর সহানুভূতিটা আন্তরিক। কিন্তু বেথি ইংরেজ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাটা আমার একেবারে নষ্ট করে দিলে!

তারিণী ॥ কেন?

রাধাকান্ত ॥ ভেবেছিলাম, ওরা বীরের জাত, ওদের মধ্যে মহত্ত্ব আছে! কিন্তু দেখছি, বেথি সাহেবের মতো ইংরেজের অভাব নেই—ওয়ারেন হেস্টিংসের রক্ত ওরা অনেকেই বয়ে এনেছে! টাকার জন্যে ওরা সব করতে পারে—টাকার বিনিময়ে সত্যকে বিক্রি করতে ওদেরও বাধে না। (আবার হাসলেন) থাক সে কথা, বেলা হলো এবার যাওয়া যাক্—

—দুই—

[আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়িতে রামমোহনের বাগান।

বাগানের ভেতরে একটি বেদী। সেই বেদীর উপর পা গুটিয়ে বসে রামমোহন কী একখানা মোটা ইংরেজী বই পড়ছেন। তিনি এখন প্রৌঢ়, কিন্তু তাঁর শক্তিমান দীর্ঘদেহে বয়সের কোনো ছাপই পড়ে নি।

সময়ঃ বিকেল।

ভৃত্য হরি একখানা থালা নিয়ে প্রবেশ করলঃ থালায় খানকতক রুটি, একটি ছোট বাটিতে কিছু মধু, এক গ্লাশ জল।]

রামমোহন॥ রেখে যা হরি।

[হরি থালা নামিয়ে চলে গেল। রামমোহন বইখানা পাশে রাখলেন, মধু দিয়ে একটু রুটি মুখে পুরলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল দশ বারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে একবার উঁকি দিয়েই সরে পড়ছে। রামমোহন সকৌতুকে তাকে ডাকলেনঃ]

কে ও বেরাদার? পালাচ্ছ কেন? এসো—এসো—

(ছেলেটি দ্বিধাভরে ঢুকল; একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।)

আরে, এ যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধরটি দেখছি! তারপর দেবেন্দ্রনাথ, কী মনে করে?

দেবেন্দ্র॥ (লজ্জিত) রমাপ্রসাদের সঙ্গে এসেছিলাম।

রামমোহন॥ ওহো—তোমরা তো আবার একসঙ্গেই পড়ো। তা শুধু নিঃস্বার্থভাবেই বেড়াতে এসেছ? যাও, অভিযান করো, লিচু টিচু খাও—

দেবেন্দ্র॥ লিচু এখনো পাকেনি।

রামমোহন॥ সন্ধানটা তবে সেরে এসেছ? কিন্তু কাঁচা বলেই পিছু হটলে? আরে বেরাদার, পাকা ফল তো পাকা চুলের জন্যে। আর কাঁচাই হল কাঁচার খাদ্য।

দেবেন্দ্র॥ না, অসুখ করবে।

রামমোহন ॥ কী সর্বনাশ? এই বয়সেই একেবারে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে বসেছ! ছাখো বেরাদার, শক্ত হওয়া চাই। দুর্বলের জায়গা নেই পৃথিবীতে। শরীরকে ভয় করবে না, শরীর যাতে তোমার ভয় করে, তাই দেখতে হবে। কাঁচা কি বলছ, এই বয়সেও আমি গাছশুদ্ধু চিবিয়ে হজম করে ফেলতে পারি। যাও—যাও। যদি টক লাগে তো নুন নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।

দেবেন্দ্র ॥ বড্ড কাঁঠপিঁপড়ে গাছে।

রামমোহন ॥ কাঠপিঁপড়েকে ভয় করলে চলে বেরাদার! বাঘ-সিঙ্গীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে—তবে তো জীবন। বেশ চলো। তুমি গাছে উঠতে না পারো, আমি উঠছি।

দেবেন্দ্র ॥ আপনি গাছে উঠবেন? (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল)

রামমোহন ॥ বাজী রাখো। তোমার চাইতে ভালো উঠব।

দেবেন্দ্র ॥ (ভয় পেয়ে) না, না—থাক!

রামমোহন ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) নাঃ, তোমরা সব ভালো ছেলে হয়ে যাচ্ছ। তা অতিথি হয়ে এসে একেবারে শুধু মুখে ফিরে যাবে? এসো, কিছু খাও আমার সঙ্গে—

দেবেন্দ্র ॥ নাঃ, থাক।

রামমোহন ॥ এও থাক? মিথ্যেই তুমি বামুনের ছেলে বেরাদার—খাওয়ার নামে ঘাবড়ে যাও? (একটু চুপ করে থেকে) ওহো বুঝতে পেরেছি। লোকে বলে, আমি অখাদ্য-কুখাদ্য খাই, তাই নয়? (হাসলেন) আমার হাতযশ আছে বটে। খাচ্ছি রুটি আর মধু, কোনো ভট্‌চাযের চোখে পড়লে বলবে, ম্লেচ্ছটা গো-মাংস সাবাড় করছে! থাক, তা হলে খেয়ো না। মিছেমিছি জাতটা আর খোয়াবে কেন?

(দু একটুকরো খেয়ে থালা সরিয়ে দিলেন।)

জল খেলেন, হাত ধুলেন। তারপর ডাকলেন) হরি—হরি—

(হরি এসে থালাটা তুলে নিয়ে গেল)

তারপর বেরাদার?

দেবেন্দ্র॥ বলুন।

রামমোহন॥ তুমি মাংস খাও?

দেবেন্দ্র॥ না।

রামমোহন॥ কেন খাও না? আরে, মাংস না খেলে শক্তি আসে? সাহেবদের দেখেছ তো? না খায় এমন মাংস নেই—গায়েও তাই বাঘের মতো জোর। আর আমরা? ঘাসপাতা চিবিয়ে চিবিয়ে প্রায় গোরু-ছাগল বনতে বসেছি। (দেবেন্দ্র চুপ করে রইলেন) মাংস খাবে, নিয়মিত মাংস খাবে। শক্তি চাই। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। হাঁ, মনে পড়ে গেল। তুমি দোলনায় দুলতে ভালোবাসো?

দেবেন্দ্র॥ (মাথা নেড়ে—সাগ্রহে) হাঁ—খুব।

রামমোহন॥ তবে চলো। বাগানের ওদিকটায় একটা দোলনা টাঙিয়েছি, চলো তোমায় দোল দেব। কিন্তু একটা কথা আছে। শুধু এক তরফা নয়—আমাকেও কিন্তু দোলাতে হবে, এমনি ছাড়ব না।

দেবেন্দ্র॥ (সোৎসাহে) আচ্ছা—(কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই কী দেখে তীরবেগে অদৃশ্য হল)

রামমোহন॥ আরে আরে কী হল! পালাচ্ছ কেন? (বিপরীত দিক থেকে দ্বারকানাথ ঢুকলেন) ও বুঝেছি! দ্বারকানাথের আবির্ভাব!

(দ্বারকানাথ এসে রামমোহনের পাশে বসলেন)

সব মাটি করে দিলে হে! সে যাক, খাবে নাকি কিছু? (ডাকলেন) রাধাপ্রসাদ—

দ্বারকানাথ ॥ (তটস্থ) থাক, থাক রক্ষা করুন! এখন খাওয়া নয়—গলা পর্যন্ত ঠাসা। কিন্তু কী হল? কী মাটি করলাম?

রামমোহন ॥ এমন চমৎকার প্ল্যানটা। তোমার ছেলের সঙ্গে দিব্যি জমে উঠেছিল, তোমাকে দেখে দেবেন পালাতে পথ পেল না।

দ্বারকানাথ ॥ ও—দেবেন এসেছে বুঝি? ও তো আবার রমাপ্রসাদের পরম বন্ধু।

রামমোহন ॥ হাঁ, বেশ ছেলেটি তোমার। ওকে আমার বড় ভালো লাগে, he is a nice boy! আমারি স্কুলের ছাত্র তো! আমি জানি, বড় হয়ে ও একটা দিকপাল হবে।

দ্বারকানাথ ॥ এখন থেকেই দিকপাল করবার প্ল্যান হচ্ছিল বুঝি?

রামমোহন ॥ প্রায় তাই। (হাসলেন) ওকে বলছিলাম, আমি ওকে দোলনায় দোল দেব, ও-ও পাল্টা দোলাবে আমাকে।

দ্বারকানাথ ॥ এই বুড়ো বয়সে দুলবেন কি রকম?

রামমোহন ॥ তাও তো বটে। বুড়ো হচ্ছি—সে কথা মনেও থাকে না। কিন্তু বয়েস বাড়াটা এমন কি অপরাধ যে তার জন্যে দোলটা অবধি খেতে পাব না! (হেসে) কিন্তু ধর্মসভার বিরুদ্ধে লড়তে বিলেত তো যেতেই হবে আমাকে। সমুদ্রের দোলানি শুনেছি সাংঘাতিক। তাই এখন থেকে রপ্ত করে নিচ্ছি—সী-সিক্‌নেসে আর কষ্ট হবে না।

দ্বারকানাথ ॥ আশ্চর্য 'উইট' আপনার! সব সময়ে একটা তৈরি জবাব আছেই! ভালো কথা, বিলেত যাওয়ার খরচা বাবদ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পাঁচহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি।

রামমোহন ॥ দরকার হবে না। ও টাকা আমি নেব না।

দ্বারকানাথ ॥ সে কি কথা! দেশের হয়ে আপনি লড়তে যাচ্ছেন, কেন নেবেন না টাকা!

রামমোহন ॥ ও টাকা দিয়ে আরো অনেক কাজ করা যাবে দ্বারকানাথ—দেশের দুঃখের তো অন্ত নেই। আমার জন্যে ভেবো না। আমার টাকা আমি জোগাড় করে নেবই। দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা হয়ে গেলে সেই টাকাতেই আমার সব কুলিয়ে যাবে।

দ্বারকানাথ ॥ হাঁ—হাঁ, ওটা কতদূর এগোল? বাদশার খবর?

(রামমোহন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বছর বারোর একটি ছেলে ছুটে এসে রামমোহনের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল।)

রামমোহন ॥ কী বাবা রাজারাম?

রাজারাম ॥ আমার ঘুড়ি ছিঁড়ে গেছে বাবা। জুড়ে দাও।

রামমোহন ॥ আচ্ছা যাও, একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

রাজারাম ॥ না, পরে নয়। এক্ষুনি জুড়ে দিতে হবে। আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারছি না।

রামমোহন ॥ (সস্নেহে) এই এলাম বলে। তুমি ততক্ষণ আর একটা ঘুড়ি ওড়াও—কেমন?

(রাজারাম ঘাড় নেড়ে দৌড়ে গেল)

দ্বারকানাথ ॥ এইটিই তো আপনার পালিতপুত্র রাজারাম?

রামমোহন ॥ হাঁ। সিভিলিয়ান ডিক সাহেব ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন হরিদ্বারের মেলায়। বিলেত যাওয়ার সময় আর কার হাতে তুলে দেবেন—আমিই ভার নিলাম।

দ্বারকানাথ ॥ শুনেছি, মুসলমানের ছেলে।

রামমোহন ॥ হয়তো। আর এই অপরাধে যাঁরা বাকি ছিলেন, তাঁরাও আমাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, শিশুর কোনো জাত নেই, সে সব জাতের উর্ধ্বে!

দ্বারকানাথ ॥ তা ছাড়া ওই রাজারামকে নিয়ে নানারকম কুৎসা—(দ্বিধাভরে থেমে গেলেন)

রামমোহন ॥ যেতে দাও ওসব। সত্য আমার, নিন্দেটা ওদেরই থাক। (একটু চুপ করে) হুঁ্যা—কী বলছিলে যেন ? সেই দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা তো ? ওঁর কেস্‌টা খুবই 'জেনুইন'। অন্যায়ভাবে কোম্পানি ওঁকে পাওনা থেকে ঠকাচ্ছে। আমাকে দূত করে বিলেতে পাঠাতে পারলে সুবিধে হবে আশা করছেন। আর আমার কথা তো জানোই। ওঁর কাজটা ছাড়াও প্রিভি-কাউন্সিলে সতী-বিল নিয়ে লড়তে হবে। আর ভালো করে জানতে হবে সভ্যতার তীর্থ ইওরোপকেও। সে আমার কত দিনের স্বপ্ন !

দ্বারকানাথ ॥ ধর্মসভার দরখাস্ত নিয়ে বেথি সাহেব বিলেত রওনা হয়ে গেছে।

রামমোহন ॥ যাক্। আমিও যাচ্ছি।

দ্বারকানাথ ॥ গণ্ডগোলটার কী হল ?

রামমোহন ॥ কোম্পানির সঙ্গে কোন settlement সম্ভব নয়। তারা এখন দেশের মালিক, বাদশার দূতকে দূত বলেই মানে না। তাছাড়া দ্বিতীয় আকবর আমাকে যে 'রাজা' উপাধি দিতে চাইতেন, তাও তারা স্বীকার করে না।

দ্বারকানাথ ॥ তবে তো মুশকিল হল !

রামমোহন ॥ (হাসলেন) মুশকিল কিছু নেই ! চাল চালতে আমিও জানি। কোম্পানি deny করুক আমার embassy, আমার title—সাধারণ মানুষ হিসাবেই পাস্‌পোর্ট জোগাড় করব আমি। তারপর ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা করব, আমি শুধু রামমোহন নই—রাজা রামমোহন রায় ! দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরের মহামান্য রাজদূত।

দ্বারকানাথ ॥ (মুগ্ধকণ্ঠে) ইচ্ছে করলে আপনি সব পারেন।

রামমোহন ॥ (বিষণ্ণভাবে হাসলেন) সব পারি ? না বন্ধু, কিছুই পারিনি। এত কাজ ছিল, এত সমস্যা ছিল ! কতটুকু এগিয়েছি সে-সব নিয়ে ?

'একমেব অদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে যে মহাজাতি আমি গড়তে চেয়েছিলাম, সে সাধনা আমার কতটা সফল হল? আজও ধর্মভেদ—বর্ণভেদ আজও অশিক্ষার অন্ধকার! আজও শাসন-পরিষদে আমাদের representation নেই, আজও আমরা জানতে শিখিনি: 'India for Indians।' দ্বারকানাথ, আমার সে Industrial India-র কল্পনা এখনো তো আকাশ-কুসুম! হল না—কিছুই হল না! অথচ জানি, জীবন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, শুরুতেই আসে শেষের পালা! যদি সেকালের ঋষিদের মতো আমি শক্তি পেতাম—

(উঠে পায়চারি করতে লাগলেন)

যদি হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারতাম, East-এর সঙ্গে West-কে মিলিয়ে সেরা দেশ গড়ে দিয়ে যেতাম আমার ভারতবর্ষকে—!

দ্বারকানাথ ॥ আপনার আদর্শ মিথ্যে হবে না। নতুন কাল আসছে, আপনার অসমাপ্ত সাধনা সে যুগ মাথায় তুলে নেব।

রামমোহন ॥ জানি। দিকে দিকে তারই সাড়া আমি পেয়েছি। সেই আমার ভরসা। হিন্দু কলেজ হয়েছে, আলো আসছে ইংরেজী শিক্ষার। সরে যাচ্ছে শাস্ত্রের নামে মূঢ়তার জগদ্দল পাথর। হিন্দু কলেজের ছেলেরা ঐ ডিরোজিওকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কী সব কাণ্ড বাধিয়েছে শুনেছ বোধ হয়!

দ্বারকানাথ ॥ একটু বাড়াবাড়ি করছে না? ডাফ্ সাহেবও ওদের বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছে। কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যের মতো আরো গোটাকতক কালাপাহাড় ছোকরা জুটলে যে দেশকে দেশ ক্রীশ্চান হয়ে যাবে!

রামমোহন ॥ বজ্র-আঁটুনির ফসকা গেরো এমনিই হয় দ্বারকানাথ। আজ হিন্দু কলেজের ভেতর দিয়ে আসছে নতুনের বিদ্রোহ—সব ভেঙে শেষ করে দেবে। আর ওই ভাঙনের পালা শেষ হলেই শুরু হবে সৃষ্টির নতুন পর্ব। বানের জল থিতিয়ে সরে গেলেই তার উপর দেখা দেবে

পলিমাটির ফসল। সেই সান্ত্বনা নিয়েই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেব আমি। (থামলেন—হাসলেন) তারপর, তোমাদের ধর্মসভার নতুন খবর কী? ধর্মচর্চা কেমন চলছে?

দ্বারকানাথ ॥ যেমন চলে। আমাদের মুণ্ডপাত। ব্রহ্মসভায় যারা আসে তাদের একঘরে করার বন্দোবস্ত। তবে বেথি সাহেব ওদের খুব ভরসা দিয়ে গেছে, সেই আশাতেই আছে এখন।

রামমোহন ॥ আশায় ছাই পড়বে। আমিও যাচ্ছি। ডেভিড হেয়ারের ফ্যামিলি, তা ছাড়া তাদের বন্ধু-বান্ধব—সকলেরই সহযোগিতা পাব।

(হঠাৎ নেপথ্য থেকে ছড়া-মেলানো বিকট চিৎকার)

"জাতের নিকেশ রামমোহন
বিত্তের নিকেশ করেছে,
হদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে—"

দ্বারকানাথ ॥ (সভয়ে) এ কী কাণ্ড?

(নেপথ্যে : "হদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে।" সেই সঙ্গে মুরগী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির-মিশ্র রাগিণী।)

রামমোহন ॥ (হাসলেন) হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে আমার অভ্যর্থনা হচ্ছে। ধর্মরক্ষার জন্যে বিধর্মীকে যে করে হোক তারা সাবাড় করবে।

দ্বারকানাথ ॥ সাবাড়!

রামমোহন ॥ হাঁ, একেবারে সাফ করে ফেলতে পারলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। ধর্মধ্বজীরা লোক লাগিয়েছে চারিদিকে—আমাকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছে তারা। রাতদিন আমার বাড়ির ওপর তারা নজর রাখে, পথে বেরুলে দমাদম ইট পড়ে আমার গাড়িতে। জানো বোধ হয় সাময়িক police protection-ও আমায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘেন্না ধরে গেছে এখন। ওভাবে বাঁচতে আমি শিখিনি। ভেবেছি,

আসুক সামনে, নিজেই রুখে দাঁড়াব এবার। শক্তি-পরীক্ষা সামনা সামনিই হয়ে যাক।

দ্বারকানাথ ॥ একটু বেশি রিস্‌ক নিচ্ছেন নাকি? একদল খ্যাপা লোকের ব্যাপার—

রামমোহন ॥ 'রিস্‌ক'! 'রিস্‌ক' সেদিনই চরম নিয়েছি—যেদিন আমার অমন মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত সম্পর্ক আমি রাখতে পারিনি। আজ আমার কাউকেই আর ভয় নেই, দ্বারকানাথ। ক্রীশ্চানদের গোড়ামিকে নিন্দে করেছি—তারা আমাকে সহ্য করতে পারে না, মুসলমানের রক্ষণশীলতাকে ঘা দিয়েছি, তারা আমার শত্রু; হিন্দুত্বের ভণ্ডামিকে আঘাত করেছি—হিন্দুরা আমার মাথা চায়। তবু যদি পিছু হটে না থাকি, একদল খ্যাপা লোকের কাছে হার মানব? বন্ধু সত্যের জন্যে দাঁড়াতে যদি আমি শিখে থাকি, তবে সেজন্যে মরতেও আমি জানি—

—তিন—

[১৮৩০ সালে কলকাতার একটি রাজপথ। একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে। পেছনে পচা ডোবা। দূরে খানকয়েক খোলার চাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

একটি বিধবা—আন্দাজ পঞ্চাশ বয়েস হবে—প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরো জনচারেক লোক। তাদের বয়েস চল্লিশ থেকে কুড়ির ভিতর।]

বিধবা ॥ আর পারিনে বাপু, পা ধরে গেছে। এখানে এই বটতলাতেই একটু বসি।

প্রথম ॥ সেকি পিসিমা! এই কলুটোলায় এসে হাঁফ ধরলে চলবে কেন। কালীঘাট কি চাট্টিখানি রাস্তা! এমন করে জিড়োতে জিড়োতে গেলে সাঁঝ পেরিয়ে যাবে যে!

পিসিমা ॥ তা আর কী করব বাপু! কালীঘাট দেখতে বেরিয়েছি বলে তো মরতে পারব না। (বটতলায় বসে পড়লেন)

দ্বিতীয় ॥ এখানে বসে থাকলেও মরবার ভয় আছে পিসিমা। শুনলুম, ভবানীপুরের ওদিকপানে সন্ধ্যের পর নাকি বাঘ বেরুচ্ছে আজকাল। গোরু-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে, দু একটা মানুষকেও চোট দিয়েছে।

পিসিমা ॥ দিয়েছে তো দিয়েছে। এতগুলো জোয়ান মর্দ রয়েছিস তোরা, তবু বাঘের ভয় কিসের? না বাবা—একটু না জিড়িয়ে আমি উঠছিনে।

তৃতীয় ॥ তবে বসাই যাক। এসো হে—হুঁকোটা বের করো।

(সকলে বসল, একজন হুঁকো বের করলে)

প্রথম ॥ চকমকি কই? শোলা?

[প্রথম লোকটি চকমকি আর শোলা বার করে দিলে; আর একজন কলকেতে তামাক সাজাতে লাগল।

এমন সময় দূর থেকে সংকীর্তনের মতো একটা অস্পষ্ট আওয়াজ এল। সঙ্গে খোল-করতালের শব্দ।]

ও আবার কিসের কেত্তন রে কানাই !

(সর্বকনিষ্ঠ চতুর্থ ব্যক্তি—অর্থাৎ কানাই কান পাতল)

কানাই ॥ সতী বিলের সংকেত্তন বেরিয়েছে খুড়ো !

পিসিমা ॥ সতী বিলের সংকেত্তন ! সে আবার কী বাছা ?

দ্বিতীয় ॥ রামমোহন রায়ের নামে ছড়া বেধেছে আর কি ! তারই শ্রাদ্ধ করছে ! (তামাক সেজে প্রথম লোকটিকে এগিয়ে দিলে)

প্রথম ॥ যাই বলো করাই উচিত। হিন্দুর বিধবা চিরকাল স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় পুড়ে মরছে—আইন করে তা বন্ধ করা কেন বাপু ! (হুঁকোয় টান দিলেন)

পিসিমা ॥ ত্থাখ্ বাছা, আর যাই বলিস্, সখ করে সব বিধবা চিতায় পোড়ে এমন মিথ্যে কথা কোস্ নি। আগুনে পুড়ে মরতে বড্ড সুখ হয় কিনা ! আর সেই সুখের আশায় মেয়েগুলো একেবারে মুখিয়ে বসে আছে !

তৃতীয় ॥ তা যা বলেছ ! এই তো বাগবাজারের বিষ্টু গাঙ্গুলীর বৌ বিন্ধ্যবাসিনীকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই হল !* সতী পুড়ে মরছে শুনে কেল্লা থেকে এক দঙ্গল সায়েব মেম তাই দেখতে গেল। চিতায় আগুন পড়তেই লাফ দিয়ে বৌটা দে দৌড় ! জোর করে পুড়িয়ে মারত ঠিকই—সায়েবরা বাগড়া দিলে। ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব পর্যন্ত গড়ালে—মেয়েটা বেঁচে গেল।

পিসিমা ॥ ভাগ্যিস সায়েবরা ছিল ! এমন কত বিন্ধ্যবাসিনীকে যে হতচ্ছাড়ারা পুড়িয়ে মেরেছে তার ঠিক ঠিকানা আছে ! আইন করেছে, বেশ করেছে ! বেঁচে থাকুক রামমোহন রায়—রাজরাজেশ্বর হোক।

প্রথম ॥ বলো কি পিসিমা ! বুড়োবয়েসে তোমার এখন মতিচ্ছন্ন হল ! তোমার যে নরকেও জায়গা হবে না।

*'সম্বাদ-কৌমুদী', মার্চ, ১৮২৮।

পিসিমা॥ নাই বা হল। চোখের সামনে কচি কচি মেয়েগুলোকে দগ্ধে মারবে আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলবে: হরি হরি! আহা হা, বাছাদের আমার কী হরিভক্তি রে! হরি কিনা মানুষথেকো দেবতা, তাই পোড়া মাংস না খেলে তাঁর আর পেট ভরছে না!

দ্বিতীয়॥ আমাদের এ দেশ তবু তো ভালো পিসিমা। সেদিন আর একটা মজার খবর শুনলুম। দিল্লীর এক শেঠজী যখন মারা গেলেন—তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমানুষ বৌকে পুড়িয়ে মারবে ঠিক করা হল। বৌটা কিছুতেই রাজী হয় না, শেষে তাকে বেশ দামী শাড়ী পরিয়ে গা-ভর্তি গয়না দিয়ে আর বেশ করে ঘি মাখিয়ে স্বামীর চিতায় কষে বেঁধে দিলে!

পিসিমা॥ ছিঃ—ছিঃ!

দ্বিতীয়॥ এখুনি ছিঃ ছিঃ করলে চলবে কেন! আরো মজা আছে। শেঠজী স্বর্গে যাবেন—সেখানে তো তার শেঠের হালেই থাকা চাই! তাই ঠিক হল, তাঁর দেওয়ান, পেশকার খিদমদগার, হুঁকোবর্দার—কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া শেঠজী তার সখের আরবী ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গের দেউড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন, নইলে ওখানকার লোকজন তাঁকে খাতির করবে কেন! তাই মস্ত একটা আকাশ-ছোঁয়া চিতা তৈরী করা হল, ঘোড়াশুদ্ধ, ঝি-চাকর-দেওয়ান-পেশকারে প্রায় পঁচিশজন লোককে শেঠের পিছে পিছে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলে!

পিসিমা॥ কী সর্বনাশ! পঁচিশজন লোক—আবার একটা ঘোড়াও সেই সঙ্গে!

দ্বিতীয়॥ হুঁ—হুঁ—তবে! এরই নাম পুণ্য—বুঝলে পিসিমা? একটা মেয়ে পোড়ালে সাতকুল স্বর্গে যায়, আর পঁচিশজন মেয়ে-মরদ

আর একটা আরবী ঘোড়া পোড়ালে কত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে সেইটে একবার হিসেব করো দেখি ?

পিসিমা ॥ আর দরকার নেই হিসেব করে—এতেই আমার দম আটকে আসছে। হাঁরে—এসব লোকগুলো মানুষ, না রাক্ষস ?

(লম্বা লম্বা খাতা হাতে দুই ব্যক্তির প্রবেশ)

প্রথম খাতাওলা ॥ এই যে—কী জাত তোমাদের ?

তৃতীয় ॥ আমরা ব্রাহ্মণ। কেন, পৈতে দেখতে পাচ্ছনা !

প্রথম খাতাওলা ॥ ব্রাহ্মণ ? বেশ বেশ। তা কী চাও তোমরা ? দেশে ধর্ম থাকে, না যায় ?

কানাই ॥ বেশ কথা তো বলছেন মশাইরা। ধর্ম যায় সেটা আবার কেউ চায় নাকি ?

দ্বিতীয় খাতাওলা ॥ চাও না তো ? শুনে খুশি হলুম। (মনে মনে কী একটা গুণে নিয়ে) তোমরা পাঁচ জন আছো দেখছি। পাঁচ আনা পয়সা বের করো তো এখন।

প্রথম (খুড়ো) ॥ পাঁচ আনা পয়সা ? কেন মশাই ?

প্রথম খাতাওলা ॥ চাঁদা।

কানাই ॥ কিসের চাঁদা ? কে আপনারা ?

দ্বিতীয় খাতাওলা ॥ আমরা 'ধর্মসভার' লোক। সতী বিল বন্ধ করব বলে চাঁদা আদায়ে বেরিয়েছি নাও—ঝট্‌পট পাঁচ আনা পয়সা বের করে ফেলো। আমাদের সময় নেই।

পিসিমা ॥ এ তো তোমাদের ভারী আবদার দেখছি। কথা নেই, বার্তা নেই, চাঁদা চাইলেই হল ?

প্রথম খাতাওলা ॥ বাজে কথা বন্ধ করো ঠাকরুণ। চাঁদা দিতেই হবে !

প্রথম (খুড়ো) ॥ অত পয়সা তো সঙ্গে নেই মশাই। আমরা কালীঘাটে

পুজো দিতে চলেছি। সামান্য যা আছে সে তো সেখানেই পুজোয় লাগবে! তা ছাড়া লম্বা পথ—জলপান-টলপান খাওয়া আছে—

দ্বিতীয় খাতাওলা॥ কালীঘাটে পুজো পরে দিলেও হবে। আগে সতী বিল বন্ধ দরকার। কই, দাও—দাও—

পিসিমা॥ ওঃ, ভারী আমার সব এলেন রে? মা-কালীর নাম করে বেরিয়েছি তার চাইতে চাঁদাই ওঁদের বেশি হল! পয়সা যেন গাছের ফল, নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে পড়ে? দেবো না চাঁদা—কী করবে?

প্রথম খাতাওলা॥ কী করব? (চটে গিয়ে) তোমাদের হুঁকো নাপিত বন্ধ করে দেব, জল অচল করে দেব, সমাজে একঘরে করে দেব—

কানাই॥ ইস্, একেবারে ভাটপাড়ার পণ্ডিত সব? চাঁদা না দিলেই হুঁকো-নাপিত বন্ধ! যাও—যাও—যা পারো করো গে। আমরা চাঁদা দেব না!

প্রথম খাতাওলা॥ তোমরা ম্লেচ্ছ! তোমরা জাহান্নামে যাবে!

কানাই॥ খবর্দার, মুখ সামলে কথা কইবে। ফের যদি গালাগাল দাও তো, (খুড়োর হাত থেকে হুঁকোটা তুলে নিয়ে) এই কলকের আগুনে মুখ পুড়িয়ে দেব হুঁকোর জল মাথায় ঢেলে দেব—

(দ্বিতীয় খাতাওলা প্রথমকে টেনে ধরল)

দ্বিতীয় খাতাওলা॥ চলে এসো—চলে এসো। এ সব নির্বোধের কথায় কর্ণপাত করতে নেই।

প্রথম খাতাওলা॥ আচ্ছা, দেখে নেব—(দুজনে প্রস্থান করল)

পিসিমা॥ যথেষ্ট জিড়োনো হয়েছে বাপু, আর কাজ নেই। আবার কোত্থেকে চাঁদার খাতা নিয়ে তেড়ে আসবে। এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে—রাস্তায় হাঁটবারও আর জো রাখেনি! চল্-চল্-এগো—

(দূরে সংকীর্তন এবং খোলকরতালের আওয়াজ)

তৃতীয়॥ ওই রে—আবার সংকীর্তনের দল! যে রকম নাচতে নাচতে

আসছে, ওরা আবার কী ল্যাঠা বাধাবে কে জানে। না বাবা—
স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ! এসো এসো পিসি-আর দেরী নয়—

(পিসিমা এবং বাকী সকলে দ্রুতবেগে উঠে পড়লেন এবং বেরিয়ে গেলেন।
শূন্য মঞ্চের উপর সংকীর্তনের আওয়াজ নিকটতর হতে লাগল। তারপর খোল-করতাল বাজিয়ে নাচতে নাচতে একদল মানুষ প্রবেশ করল।
কিছুক্ষণ ধরে মঞ্চের ওপর চলল তাদের উদ্দাম নৃত্যগীত)

গান

ব্যাটার সুরাইমেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল—

(সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসি ও জীবজন্তুর ডাক)

ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল
ওঁ তৎ সৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল,
ধর্মাধর্ম গেল ব্যাটা মজালে জাতকুল!

(বিকট আনন্দে কিছুক্ষণ নাচানাচি, মুখভঙ্গি ও চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে জনতা অদৃশ্য হল।
বিপরীত দিক থেকে রামমোহন রায় ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন।
গুরুদাস এখন মধ্যবয়সী—কিন্তু বলিষ্ঠ ও পেশল চেহারা। রামমোহনের হাতে 'ওয়াকিং ষ্টিক'-জাতীয় বেশ মোটা একটা লাঠি।)

গুরুদাস॥ (সক্রোধে) মামা—আবার! উঃ অসহ্য! ইচ্ছে করছে এখনি গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ওদের মধ্যে। দু দশটার মাথা ভেঙে কেত্তন গাওয়া বন্ধ করে দিই!

রামমোহন॥ বয়েস হয়েছে গুরুদাস, তবু এখনো তোমার গোঁয়াতুর্মি গেল না?

গুরুদাস॥ গোঁয়াতুর্মি কী বলছ মেজ মামা? এই রকম অত্যাচার সয়ে যেতে হবে? প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারব না?

রামমোহন॥ শোনো গুরুদাস। একদিন কথা দিয়েছিলাম, যদি কখনো

কোনো নতুন ধর্ম আমি প্রচার করি, তার প্রথম দীক্ষা নেবে তুমিই। সে কথা আমি রেখেছি, আজ তুমিই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাই ব্রহ্মের দায়িত্ব তোমাকে ভুললে চলবে না। তোমার সাধনা জ্ঞানের জন্যে, তোমার লক্ষ্য সত্যের দিকে। কতগুলো অজ্ঞানের ওপর শক্তি ক্ষয়, করে সে লক্ষ্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হতে চাও?

গুরুদাস॥ ছাখো মেজ মামা, কিছু মনে করো না। জানোই তো আমি বরাবর বেয়াড়া—মেজাজ আমার তোমার মতো ঠাণ্ডা জল নয়। কুকুর যদি কামড়াতে আসে, তাহলে তাকে না ঠেঙিয়ে বেদবাক্য শোনাব, এমন ব্রাহ্মণ হওয়া আমার ধাতে কুলুবে না।

রামমোহন॥ ছিঃ গুরুদাস—ছিঃ! মতভেদ থাকতেই পারে, তাই বলে মানুষকে কুকুর বলে গাল দেবে?

গুরুদাস॥ কিন্তু ওরা যে গাল দিচ্ছে! ওরা তো ছেড়ে কথা কইছে না!

রামমোহন॥ তা হোক। ওরা পাঁকে নেমেছে বলে তুমিও নামবে?

গুরুদাস॥ আর ওরা যদি আক্রমণ করে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে নাকি? প্রাণ দেবে?

রামমোহন॥ না, তা দেব না। (কঠিনভাবে হাসলেন) বৈষ্ণবকুলে জন্ম হলেও আমি বৈষ্ণব নই—আমি শক্তির সাধক। আত্মরক্ষার জন্যে একদিন বুদ্ধকেও গ্রহণ করতে হয়েছিল সুজাতার অন্ন। আমার হাতেও এই লাঠি আছে—এর ভেতরে আছে গুপ্তি। এর প্রয়োজন হোক তা আমি চাই না, কিন্তু যদি—

(রামমোহনের বাকী কথাটা আর শোনা গেল না। হঠাৎ আবার সেই তারস্বর কীর্তন জেগে উঠল:

ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা
মজালে জাতকুল)

গুরুদাস ॥ (চকিত) মামা-মামা। ওই যে—মোড় ঘুরে ওরা এদিকেই আবার আসছে!

রামমোহন ॥ আসতে দাও।

গুরুদাস ॥ আর এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে? চলো বরং অন্যদিকে—

রামমোহন ॥ (দৃঢ়স্বরে) না। ভীরুর মতো অনেক পালিয়ে থেকেছি, আর নয়। গুরুদাস, আজ এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও পঞ্চাশজনের মহড়া নেবার মতো শক্তি শরীরে আমি রাখি। আসুক ওরা—মুখোমুখি ওদের আমি একবার দেখতে চাই—

[নেপথ্যে চিৎকার:

—ওই যে শালা—ওখানে—!

—ভাগ্নেটাও আছে—

—মার—শালাদের মার—।]

গুরুদাস ॥ (ক্ষিপ্তভাবে) তোমার গুপ্তিটা দাও মামা। ভাগ্নের জোরটাই পরখ হোক আগে!

রামমোহন ॥ স্থির হও—দাঁড়াও গুরুদাস—

[নেপথ্যে:

—মার শালাকে—

—খুন করে ফ্যাল—

—চালাও ঢিল—

কয়েকটা ঢিল-পাটকেল এসেও পড়ল।]

গুরুদাস ॥ মামা, ওরা এদিকেই আসছে। আমি যাই—(এগোতে চাইলেন, রামমোহন বাধা দিলেন)

রামমোহন ॥ থামো, আমি দেখছি—

(এগিয়ে গিয়ে)

কারা তোমরা? কী বলতে চাও? সামনে এসো—

[—মার শালাদের—মার—মার
আরো কিছু ইট-পাটকেল এল।]

এসো—সামনে এসো। যুদ্ধ করতে চাও? বেশ আমিও তৈরী। কার শক্তি আছে, এগিয়ে এসো! (হঠাৎ গুপ্তিটা টেনে বের করলেন) জেনে রেখো, কয়েকটা প্রাণ এখানে না রেখে আমার প্রাণ নিতে পারবে না—

রামমোহনের কণ্ঠস্বর বজ্রধ্বনির মতো শোনালো; নেপথ্যে অর্থহীন কোলাহল।]

পালাচ্ছ? (রামমোহন আরো এগিয়ে গেলেন) পালাচ্ছ কেন? এটুকু নৈতিক সাহস নেই? ধর্মের জন্যে এতই যদি আকুল হয়ে থাকো, তা হলে প্রাণ দেবার শক্তি নেই তোমাদের? পালিয়োনা—এগিয়ে এসো—এসো এগিয়ে—

[নেপথ্যে কোলাহল ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল]

পালালো—ওরা পালিয়ে গেল গুরুদাস। ভীরু—ভীরুর দল! (গুপ্তিটা মাটিতে ফেলে দিলেন) তুমিই ঠিক বুঝেছিলে গুরুদাস। সব গেছে, এ অভিশপ্ত দেশ থেকে সব গেছে! একটা মানুষও আজ আর কোথাও বেঁচে নেই, না, একটাও না—

—চার—

[রামমোহনের বাড়ির অন্তঃপুরের একটি ঘর। সন্ধ্যা। একখানা ছোট জলচৌকির উপরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন উমা। উচ্ছ্বসিত কান্নায় তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতায় কাটল। প্রায় আধ মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে রামমোহন প্রবেশ করলেন। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইলেন উমার দিকে। শেষে মৃদুগতিতে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন উমার কাঁধের ওপর।]

রামমোহন ॥ (স্নিগ্ধস্বরে) ছিঃ—কাঁদতে নেই! দ্বারকানাথ ওঁরা সবাই এইমাত্র প্রসন্ন মুখে বিদায়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন, আর তুমি কাঁদছ?

(উমা জলভরা চোখ তুলে তাকালেন)

কেন এমন অবুঝ হচ্ছ উমা? জীবনের সমস্ত দুর্দিনেই তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ—কোনোদিন তো ভেঙে পড়োনি। আজ এ দুর্বলতা কেন তোমার?

উমা ॥ তুমি যেয়োনা—বিলেতে তুমি যেয়োনা—

(রামমোহনের বুকে মাথা রাখলেন)

রামমোহন ॥ (উমার মাথায় হাত বুলিয়ে) শোনো উমা—আমার কথা শোনো। সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে দূর-দেশান্তে চলেছি, তাতে আমার ভয় নেই। কোম্পানির রাজত্ব বাধা দিয়েছিল, সে বাধা আমি পার হয়েছি। এই রক্ষণশীল দেশে বিলেত যাওয়ার পরিণাম কী, তাও আমি জানি। কিন্তু তোমার চোখের জলের বাধা যে আমার কাছে সব চেয়ে দুস্তর উমা! নীলাচলে মা যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তাঁর কাছ থেকে শেষ আশীর্বাদ পাওয়ার ভাগ্যও আমার হল না। আজ তুমিও কি আমার যাত্রার পথ দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ভরে দেবে?

উমা ॥ সব সয়েছি, কোনদিন একটি কথাও বলিনি। কিন্তু আজ আমি এ কী করে সইব? কোথায় তুমি চলেছ—কালাপানি পার হয়ে কোন্ নিবান্ধব দেশে! শরীরও তোমার ভালো নয়। সেখানে কে তোমায় দেখবে? বিপদে-আপদে কে রক্ষা করবে? ওগো—না, না! আমার বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমার সামনে থেকে সরে গেলে আর হয়তো তোমায় দেখতে পাব না!

রামমোহন ॥ (হাসলেন) কেন মিথ্যে এসব তুমি ভাবছ? তা ছাড়া ফিরে যদি নাই-ই আসি, তাতেই বা ক্ষতি কী উমা? একদিন তো সকলকেই চলে যেতে হবে! (উমা কেঁদে ফেললেন) আবার পাগলামি করছ? কেন আজ আমি বিলেতে চলেছি, সে তো তুমিই সব চাইতে ভালো করে জানো। দিল্লীর বাদশার দূতগিরি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ বিল বন্ধ করবে বলে ওদের দরখাস্ত নিয়ে রওনা হয়েছে বেথি সাহেব। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ আমায় করতেই হবে। উমা, সিদ্ধির পথে এতটা এগিয়ে এখন তুমি আমায় হার মানতে বলো?

উমা ॥ কিন্তু—

রামমোহন ॥ কিন্তুর শেষ নেই উমা। তাই আমার অভিধান থেকে ও শব্দটাকেই মুছে ফেলেছি আমি। তা ছাড়া সভ্যতার মহাতীর্থ ইওরোপের সাধনার রহস্যও যে আমাকে জানতে হবে! ওদের শিক্ষা, ওদের শিল্প, ওদের জীবন-সত্য—সব যে আমায় বুঝতে হবে উমা। আমায় প্রণাম করতে হবে স্বাধীনতার বৈকুণ্ঠ ফ্রান্সকে—Equality, Liberty, Fraternity! সেই একমুঠো মাটি যে আমার দেশের কপালে তিলক পরিয়ে দেবার জন্যে কুড়িয়ে

আনব! মার্সেই! কবে আমাদের দেশের কবিও অমনি করে জাতীয়-সঙ্গীত লিখবে? কবে?

[তন্ময় হয়ে গেলেন।

—বাবা—ডাক দিয়ে রাধাপ্রসাদ ঘরে ঢুকেই সলজ্জ ভাবে বেরিয়ে যেতে চাইলেন]

রামমোহন ॥ কী খবর রাধাপ্রসাদ?

রাধাপ্রসাদ ॥ একটা ঘটনা শুনলাম বাবা।

রামমোহন ॥ কী হয়েছে?

রাধাপ্রসাদ ॥ ফ্রান্সিস বেথি যে জাহাজে করে ধর্মসভার দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ে সে জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে।

(উমা বিহ্বলভাবে তাকালেন, রামমোহন চমকে উঠলেন)

রামমোহন ॥ জাহাজ ডুবে গেছে! তা হলে বেথি সাহেব—

রাধাপ্রসাদ ॥ কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছেন। কিন্তু দরখাস্ত-টরখাস্ত সব গেছে।

রামমোহন ॥ (হেসে উঠলেন) তবে তো দেখা যাচ্ছে, ধর্মসভার ওপরেই ধর্ম বিরূপ! এ আমাদেরই শুভ-সূচনা রাধাপ্রসাদ!

রাধাপ্রসাদ ॥ তাই তো মনে হচ্ছে বাবা।

(বেরিয়ে গেলেন)

উমা ॥ (ব্যাকুল হয়ে) শুনলে তো? সমুদ্রে বেথি সাহেবের জাহাজ ডুবে গেছে। (কেঁদে ফেললেন) কোন্ প্রাণে তোমায় আমি যেতে দেব? না, না, কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।

রামমোহন ॥ এত বড় সুখবরটাকে তুমি ভুল বুঝলে উমা? বেথির জাহাজ ডুবেছে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সতীর দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড়ে। কিন্তু আমার জাহাজে তাদের আশীর্বাদে উনপঞ্চাশ পবনের বেগ লাগবে! আমার জাহাজ কখনো ডুববে না উমা, কিছুতেই না!

উমা ॥ (চোখের জল মুছলেন) না, আর কাঁদব না। মিথ্যেই চোখের

জল ফেলছিলাম। পৃথিবীতে কেউ তোমায় রুখতে পারেনি, জানি, আমিও পারব না। শুধু একটা কথা রাখো আমার। যদি যাবেই, রাধাপ্রসাদকেও সঙ্গে নাও। ও কাছে থাকলে তবু খানিক ভরসা পাব।

রামমোহন ॥ তা হয়না উমা। এখানে অনেক কাজ—রাধাপ্রসাদ গেলে সে সব দেখবে কে? তা ছাড়া ব্রহ্মসভার সমস্ত ভারও ওর ওপরে। ওকে নিয়ে গেলে এখানে যে সব অচল হয়ে যাবে!

উমা ॥ কিন্তু এমন একা একা তোমায় কী করে যেতে দেব?

রামমোহন ॥ একা কেন? রামরতন মুখুয্যে যাবে, হরি যাবে, বক্সু শেখকেও সঙ্গে নেব—

উমা ॥ ওরা তো কেউ আপন জন নয়!

রামমোহন ॥ আপন কি শুধু রক্তে? তা যে কত মিথ্যে, আমার জীবনেই কি সেটা দেখোনি উমা? তা ছাড়া যে দেশে চলেছি, জানি—সেখানেও আমার আপন জন আমাকে কাছে টেনে নেবেই—

(ছুটে রাজারাম প্রবেশ করল)

রাজারাম ॥ বাবা—বাবা—

রামমোহন ॥ কী বাবা?

রাজারাম ॥ বাগানের সেই দোলনাটার আমার দোল দেবে বলেছিলে যে! (হাত ধরে টানল) এসো—

রামমোহন ॥ তুমি যাও রাজারাম—আমি এক্ষুণি আসছি—

রাজারাম ॥ হাঁ, এখুনি এসো। দেরী করো না কিন্তু—(ছুটে চলে গেল)

রামমোহন ॥ (কিছুক্ষণ রাজারামের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে) পেয়েছি—পেয়েছি!

উমা ॥ কী পেয়েছ তুমি?

রামমোহন ॥ আমার সঙ্গী—আমার আপন জন।

উমা ॥ কে তোমার সঙ্গী ? কে তোমার আপন জন।

রামমোহন ॥ ওই রাজারাম। (একটু চুপ করে রইলেন) হাঁ, ওই আমার সঙ্গে যাবে। বাপ-মামরা মুসলমানের ছেলে, সাহেবেরা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আমি ওকে সন্তান বলে বুকে টেনে নিয়েছি। মুসলমান—ক্রীশ্চান—হিন্দু—ও তো কেও না! ওর কোনো জাত, কোনো ধর্ম নেই, তাই ও সকলের! ওর মধ্যে এসে সব জাত এক হয়ে গেছে—ওর মুখে আমি আমার স্বপ্নের মহাজাতিকে দেখতে পেলাম!

(মঞ্চের একেবারে সম্মুখের দিকে এগিয়ে এলেন)

তাই আমার যাত্রাপথে ও আমার আলো, বিদেশে ও আমার প্রেরণা, ওই-ই আমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'! উমা—উমা! এই জীবন্ত ভারতবর্ষকে বুকে নিয়েই আজ আমি ইওরোপ যাত্রা করলাম। এই ভারতবর্ষই রক্ষাকবচ হয়ে আমায় ঘিরে থাকবে, আমায় শক্তি দেবে! আর আমার কোনো দ্বিধা নেই! উমা—উমা, পেয়েছি, আমার পাথেয় আমি পেয়েছি—

(দিনান্তিক সূর্যের একটা রক্তিম আলো জানলা দিয়ে রামমোহনের প্রদীপ্ত মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রইল।)

—পর্দা পড়ল—

কলকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

সমাপ্ত